কলেজ স্মৃতি

সচলায়তনের কলেজ স্মৃতি সংকলন

কলেজ স্মৃতি

সচলায়তনের কলেজ স্মৃতি সংকলন

প্রকাশায়তন

কলেজ স্মৃতিঃ সচলায়তনের কলেজ স্মৃতি সংকলন।

কলেজ স্মৃতি

সচলায়তনের কলেজ স্মৃতি সংকলন

১ম আন্তর্জাল সংস্করণঃ ১০ জুন ২০১০ (প্রস্তাবিত)
১লা জুলাই ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ | ১৭ আষাঢ় ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

প্রকাশকঃ প্রকৃতিপ্রেমিক
উইন্ডজর, কানাডা
ইমেইলঃ propremik@gmail.com
© প্রকাশায়তন | সচলায়তন ডট কম

প্রচ্ছদঃ নজরুল ইসলাম
অলঙ্করণঃ আসাদুজ্জামান রুমন
সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ প্রকৃতিপ্রেমিক

'College Smriti', a collection of memorable incidents during the college life, published by Prokriti Premik on behalf of Prakashayatan, Sachalayatan dot com; cover designed by Nazrul Islam; page designed by Asaduzzaman Ruman; first internet edition published on July 2010, Asharh 1417

মুখবন্ধ

আমাদের প্রিয় সচলায়তনের জন্মদিনে সবাইকে শুভেচ্ছা। সচলায়তন আজ চতুর্থ বছরে পা দিলো। দেখতে দেখতে সেদিনের শিশু সচলায়তন এখন অনেক পরিপক্ক। এই পরিপক্কতা এসেছে এর ধারণ করা সচল, হাচল, অতিথি সচল, অতিথি এবং পাঠককুলের নানা রকম ব্যাপ্তিতে। সবার দৃপ্ত পদচারণায় মুখরিত হয়ে থাকছে এর আয়তন। সমৃদ্ধ হচ্ছে নানা ধরণের লেখনির গুণে। প্রকাশিত হচ্ছে নানা আঙ্গিকে সব ই-বুক, ব-e। তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই সংযোজন, "কলেজ স্মৃতি"।

কলেজ স্মৃতি মূলতঃ সময়ের সিন্দুকে আবদ্ধ এক মুঠো সময়ের উপাখ্যান। যেখানে আমরা বিচরণ করি সন্তর্পণে, একাকী, কলেজের ফেলে আসা দিনগুলোতে। কলেজের দেড় দুই বছর জীবনের খুবই অল্প একটা সময়। স্কুলের গণ্ডী পার হওয়ার সময়টাতে যে আগ্রহ আর উদ্দীপনা নিয়ে কলেজ নামক বিদ্যালয়টিতে পা ফেলার আশায় দিন কাটে, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাওয়ার ঘণ্টা বেজে ওঠে। কলেজের স্মৃতি তাই কারো কারো কাছে বিস্মৃত। তবুও জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এই কলেজের সময়টুকু। কারো কাছে সেই সময়টুকু কাটে রেল ভ্রমণের মতো- যেন এক স্টেশনে উঠে ঠিক পরের স্টেশনে নেমে পড়া; আবার অনেকের কাছে কলেজের সময়টুকু হয়ে পড়ে সামনে যাওয়ার প্রথম ধাপ। মানুষের জন্য ছোট্ট একটা পদক্ষেপ যেমন সমগ্র মানব জাতির জন্য বিশাল পদক্ষেপ নিয়ে আসে, কলেজের স্বল্পকালীন শিক্ষা জীবনও তাই। ই-বুকের এই ক্ষুদ্র পরিসরে সমগ্র জীবনের সেই সময়টুকু ধারণ করা তাই যেনো হাত বাড়িয়ে চাঁদকে ছুঁয়ে দেয়া! আপাত এই অসম্ভব কাজটির সম্পাদিত রূপই কলেজ স্মৃতি।

সর্বমোট পঁচিশটি লেখা নিয়ে সাজানো এই সংকলনটিতে উঠে এসেছে আনন্দ-বেদনার নানা স্মৃতি। দেরীতে হলেও কলেজের স্মৃতি নিয়ে লেখাগুলোর সংকলন পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আনন্দিত মনে হচ্ছে।

বইটি ১০ জুন প্রকাশ করার কথা থাকলেও নানা অপ্রত্যাশিত কারণে সেটা করা হয়ে ওঠে নি। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। কলেজ স্মৃতি সম্পূর্ণ ইউনিকোড ভিত্তিক এবং খুব স্বল্প সময়ে, আজকের দিনটিকে (১লা জুলাই; সচলায়তনের জন্মদিন) সামনে রেখে প্রকাশ করা হয়েছে। ভুল-ত্রুটি থাকা অবশ্যম্ভাবী। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে বলে আশা রাখি।

ধন্যবাদ সকলকে যারা তাদের স্মৃতি আমাদের সাথে ভাগাভাগি করেছেন। ধন্যবাদ নজরুল ভাইকে সুন্দর একটি প্রচ্ছদের জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে বইটি ডাউনলোড করার জন্য।

'কলেজ স্মৃতি'র ব্যাপারে আপনাদের যে কোন রায় মাথা পেতে নেয়ার বাসনা ব্যক্ত করে ইতি টানছি। ভালো থাকুন।

প্রকৃতিপ্রেমিক
উইন্ডজর, কানাডা
http://www.sachalayatan.com/user/propremik

আসাদুজ্জামান রুমন
সচলায়তন ডট কম
http://www.sachalayatan.com/user/ruman

সূচিপত্র

[নির্দিষ্ট লেখায় যেতে শিরোনাম বা লেখকের নামের ওপর ক্লিক করুন]

শিরোনাম - লেখক

কলজেয় কোলাজিত কলেজস্মৃতি - মহাস্থবির জাতক
ঘাস-মাটির দিন - স্পর্শ
এই ছেলে দাঁড়াও - জাহিদ
লেজ গজানোর দিনগুলি - জি.এম.তানিম
যে দিনগুলো সাঙ্গ হল ঝড়বাদলের জলে - রাফি
কলেজের করিডোরে - মর্ম
দুর্বিসহ সূচনা - নীড় সন্ধানী
উত্তর ছাত্রাবাস - ফারুক হাসান
থ্রী চিয়ার্স ফর গ্রুপ ওয়ান - কাকুল কায়েশ
অনেক পরে একদিন - মেয়ে
বন্ধুরা এলোমেলো - পান্থ
স্বপ্ন হন্তারক - অচ্যুৎ বলাই
ঢাকা কলেজের স্মৃতি - তাসনীম
হলিক্রস উই শ্যাল বি ট্রু - আনন্দী কল্যাণ
অনাকাঙ্খিত দীর্ঘশ্বাসের দিনগুলো - জুলিয়ান সিদ্দিকী
জলবতী মেঘের বাতাস - তিথীডোর

সূচিপত্র

স্কুল ইউনিফর্ম পড়া লোকটি - সুহান রিজওয়ান
কলেজের কঠিন দিন - পুতুল
কলেজের কিছু কথা - পাগল মন
চিকিৎসা বিভ্রাট - কৌস্তুভ অধিকারী
কলেজের দিনগুলি - ধুসর গোধূলি
ঢাকা কলেজের ঢাকনাহীন বয়ান - নজরুল ইসলাম
স্মৃতির বুদবুদগুলো - প্রকৃতিপ্রেমিক
মনে পড়ে প্রতি টানে - স্পার্টাকাস
কলজেতে যেই কলেজেরই এক ছাপ নিয়ে দিই পথপাড়ি - সাইফুল আকবর খান

স
প্রকাশায়তন

তুলনামূলকভাবে আমার মনে হয় কলেজের চাইতে স্কুলের মজাটাই বেশি। কারণটা মূলত সময়ঘটিত। পৌনে দু'বছরের সাথে দশ বছরের পাল্লা দেওয়াটা কঠিনই। তারওপর সেই দশ (বা কিছু কমবেশি) বছরটা যদি আবার হয় ছেলেবেলার। তবে, কলেজ জীবনের মজাটা অন্য জায়গায়। বয়ঃসন্ধিকালের মুক্তির আনন্দের উচ্ছ্বাস বা বাঁধনহারা হওয়ার প্রথম শেকলছেঁড়ার আওয়াজটা নিশ্চয় প্রাণে বা কানে মারাত্মক ঠেকে। হঠাৎ করে কুয়োর ব্যাঙ নদীতে এলে যেমনটা হয় আর কি! কী করি আজ ভেবে না পাই গোত্রের মরিমরি জোয়ারে ভাসার দলে অবশ্য আমি ছিলাম না কখনোই। হয়তো আমার মানসিকতাই এজন্যে দায়ী। যাহোক, সেই সময়ের কিছু মনে-থাকা কাহিনি স্মৃতির ঝাঁপি খুলে আজ নেড়েচেড়ে দেখি, দেখি কাল কতটুকু পলি ফেললো তার ওপর, দেখি এই আকালে কিছুটা খুশি হয়ে ওঠা যায় কি না, দেখি কতটা দূরে সরে গেছি সেসব হয়ে-ওঠার দিন থেকে।

পেরথমে বন্দনা করি...

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল যারপরনাই খারাপ। টেনেটুনে প্রথম বিভাগ।

ওঃ, বলি নি বুঝি আমি বেশ একটু প্রাচীনপথিক? পরীক্ষাও দিতে হতো আমাদের কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্যে। দিলাম তিনটে কলেজের চারটে বিভাগে চট্টগ্রাম কলেজে বিজ্ঞান আর মানবিক বিভাগে, মহসিন-এর বিজ্ঞান আর কমার্স কলেজে। মানে সবক'টা বিভাগই খোলা রাখা হলো, মূল পরিকল্পক বাবা।

তখন ভর্তি বাণিজ্য এখনকার মতো রমরমা নয়। একটা শিবির প্রকাশিত সহায়িকা 'ইনডেক্স' কিনলাম। ওটাই শিবিরের সাথে আমার প্রথম সম্পর্কের অপরাধ। শিবিরের গাইডটার ওপরে চট্টগ্রাম কলেজে ঢোকার পথের একটা লোগো। বোঝা যায়, ইংরেজি অক্ষরে একইসাথে জড়িয়ে 'এ' এবং 'কে' লেখা। মা জানালো, ওটা আইয়ুব খানের নামের আদ্যক্ষর। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, স্বাধীনতার এতো বছর পরেও ওটা আজও টিকে আছে। একই স্থাপত্য দেখেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার দু'পাশে। এসব কি ধ্বংস হবে না কখনো?

যাক, কিভাবে যেন টিকে গেলাম সবকটাতেই। এরপর পছন্দের মধুর সমস্যা। তখন চট্টগ্রাম কলেজে টেকার খাতিরই আলাদা। বছরখানেক আগে কুমিল্লা বোর্ডে প্রথম হওয়া একজন ছাত্র এখানকার ভর্তি পরীক্ষা থেকে ছিটকে গেছে এই গল্প শোনা। সাফল্যকৃচ্ছ আমার তাই এই তো হাতে স্বর্গ-পাওয়া। অতএব, বাধ্যতামূলকভাবেই চট্টগ্রাম কলেজ, বিজ্ঞান বিভাগই হলো ঠিকানা।

একদিন স্বপ্নের দিন...

ভর্তির আগে একদিন আমাদের রোল নম্বর ধরে দিনানুসারে ভাগ করে করে সাক্ষাৎকারের জন্যে ডাকা হলো। আশঙ্কা জাগলো আবার এতে বাতিল হয়ে যাই কি না! গেলাম। সাক্ষাৎকারগ্রহীতা একজন শিক্ষক বললেন আমায় উদ্দেশ করে (কিসের ধারাবাহিকতায় এখন খেয়াল নেই), "মোটা মানুষদের বুদ্ধিও মোটা হয়।"

চোখে পানি আসার জোগাড়। কিছুদিন আগে পত্রিকায় পড়া এক প্রবন্ধে-পাওয়া যুক্তিতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করি, "শেরে-বাংলা, চার্চিল এঁরাও তো মোটা ছিলেন।"

ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে স্যার বলেন, "ওঁরা ব্যতিক্রম।"

পরে অবশ্য এই স্যারই আমার বেশ পছন্দের একজন হয়ে উঠবেন এবং জানতে পারবো তিনি অঙ্ক করান, আব্দুস সালাম। আর, অতিযত্নে গড়ে তোলা আমার নাহাপাতিয়ার কারণে আমি পরে কলেজে বন্ধুদের ভালোবাসাসঞ্জাত 'গর্ভবতী' উপাধি পাবো এবং কেউ কেউ আমার গর্ভধারণকাল সুনির্দিষ্ট করে সেই নামেই আমায় চিহ্নিত করবে।

টিকলাম।

প্রথম দিন গেলাম কলেজে। রুটিন যোগাড়, সেকশন চেনা, স্কুলের পুরনো বন্ধুদের বর্তমান অবস্থান আলোচনা এসব জরুরি কাজেই বোধহয় প্রথম ক'দিন চলে গেলো।

এরমধ্যে একদিনের একটা ঘটনা বলি।

আমার বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু একজন (এখন সে ডাক্তার) আগে থেকেই পরিচিত ছিলো কয়েকজন কলেজিয়েটের প্রাক্তন এবং চট্টগ্রাম কলেজের বর্তমান সতীর্থের সাথে। তাদের মধ্যে ক'জন তাকে ডেকে নিয়ে গেলো। আমিও রইলাম সঙ্গে। রসায়ন বিভাগের সামনে নিয়ে তাকে তাদের একজন স্বাভাবিক গলায় বললো, "রিয়াদের

বাবা তো নিউরোলজিস্ট (আসলে নিউরোসার্জন, সে-আমলে চট্টগ্রামের বিখ্যাত চিকিৎসক এল. এ. কাদেরী)। উনি বলসেন মানুষের কান দু'হাতে চেপে ধরলে বাইরের কোন শব্দ যদি তার কানে না যায়, তাহলে নাকি তার স্মৃতিশক্তি কাজ করে না। দেখবি?" বন্ধু রাজি।

প্রথম প্রশ্ন, "একটা বড় সংখ্যা বল।" বন্ধু বলে, "৭৩০।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন, "একটা তেলের নাম বল।" বন্ধু বলে, "নারকেল তেল।"

তৃতীয় প্রশ্ন, "একটা সাবানের নাম বল।" বন্ধু বলে, "লাক্স।"

"ঠিক আছে। এবার আমি তোকে আঙ্গুল দেখিয়ে তোকে প্রশ্ন করবো, আর তুই ওগুলো আবার বলবি। একটা আঙ্গুল দেখালে সংখ্যাটা, দুটো আঙ্গুল দেখালে তেলের নাম আর তিনটা আঙ্গুল দেখালে সাবানের নাম। ঠিক আছে?"

বন্ধু নিশ্চিন্ত। আরে এগুলো ব্যাপার না কি?

প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে ক'জন নিয়ে গেল বন্ধুকে।

আমি প্রশ্নকর্তার পাশে। একজন বন্ধুর মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে শক্ত করে তার কান চেপে ধরে আছে। তার পাশে আরো ক'জনা। নিশ্চিত করা হলো যে সে শুনছে না।

এবার প্রশ্নকর্তা শুরু করলো। মোটামুটি অনতিউচ্চ গলায় একটা আঙ্গুল দেখিয়ে সে প্রথম প্রশ্ন করলো, "তোদের বাড়ির কাজের মেয়ে তোরে কতবার ..দসে?"

বন্ধু বলে, "৭৩০।"

দুটো আঙ্গুল দেখিয়ে, "কী তেল দিয়ে ...দসিলো?"

"নারকেল তেল।"

তিনটে আঙ্গুল দেখিয়ে, "তারপর কী সাবান দিয়ে গোসল করলি?"

"লাক্স।"

হাসির চোটে মাটিতে বসে যাওয়ার দশা। প্রসঙ্গান্তর ঘটালে সাদামাটা জিনিস কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তার নমুনা প্রথম দেখি। এরপর অনেককেই দেখি তা কাজে লাগাতে, আমার বিরুদ্ধেও দু'একবার, যদিও নিজে পারি নি কখনোই।

এরই নাম পড়া...

কলেজে যাওয়া মানেই লেজ গজানো, শিবরাম চক্রবর্তী বলেছিলেন, আরো জানিয়েছিলেন তিনি ওখানে গেলে সাধারণত ন'লেজ গজায়। কোনটাই গজায় নি আমার- না Knowledge, না 'ন'লেজ'। মূলত পড়ার জন্যে ছাত্রজীবন, কিন্তু আমার এবং বোধহয় আরো অনেকের বেলায় সেটা হয়ে দাঁড়ায় স্যারের বাসায় পড়া। প্রাইভেট পড়া।

সপ্তাহে তিন দিন সকাল সাতটায় বেরিয়ে সন্ধ্যে সাতটায় পড়া শেষ করে বিদ্যাদিগগজ, বিদ্যারত্ন, জ্ঞানাম্বুধি, জ্ঞানার্ণব হয়ে বাসায় ঢুকেছি, কিন্তু, শেষমেষ শেখা হয় নি কিছুই। পাস করেছি, এরপর আরো পাস করেছি, এরপর আরো। কিন্তু, পড়া মুখস্থই সার, বিদ্যার্জন হয় নি বিন্দু পরিমাণ। প্রথম বর্ষ শেষে পরীক্ষা। কোন একটা পরীক্ষার দিন পড়লো সরস্বতী পূজা। হিন্দু কয়েকজন ছাত্র প্রতিবাদ জানিয়ে এলো অধ্যক্ষের কাছে গিয়ে। ফলাফল ঠিক খেয়াল নেই।

এদিকে অংক পরীক্ষা এলো। আমার ভয়ের সময়। ঠিক ১৮ নম্বরের উত্তর করলাম। পেলাম ১৫। আঃ, সাফল্যের হার দারুণই বটে! উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও একই কাণ্ড। বাংলা পরীক্ষায় রচনা এলো 'বর্ষণমুখর রাত'। এক বন্ধুর বিবরণ এখনও মনে আছে, "এই রাতে নারী-পুরুষেরা আদিম খেলায় মেতে ওঠে।"

রবি কবির দফা সেরে তিরিশি কবিদের ছেরাদ্দ আর কি! বললে পেত্যয় যাবেন না, সে-পরীক্ষার ফলাফল আমাদের বাসায় ডাকযোগে চলে এসেছিলো। এরপরের কাহিনি আপাতত এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

আসলে যেটা বলতে চাইছিলাম, সেটা হচ্ছে কলেজে আমাদের কোন লেখাপড়া হতো বলে কখনো মনে হয় নি। স্যার-ম্যাডামেরা আসতেন যেতেন, আমরা ক্লাস অনেক সময়ই করতাম না। প্রক্সি ছিলো মধুর জিয়নকাঠি। আমাদের এক সতীর্থ মেয়েদেরও প্রক্সি দিতো, গলাখানাই ঈশ্বরপ্রদত্ত কিনা। মেয়েরাও কেউ কেউ ছেলেদের প্রক্সি দিতো বলে শুনেছিলাম, অন্তত আমাদের সেকশনে এঘটনা ঘটে নি। ছেলেদের কেউ কেউ প্রক্সির রেকর্ড করারও চেষ্টা করতো। আজ পেছন ফিরে তাকালে মাত্র দু'একজন শিক্ষকের কথা মনে পড়ে যাঁদের ক্লাস করতাম আগ্রহ নিয়ে। বন্ধু-বান্ধবেরা অন্য কলেজে ক্লাস-টাস করতে যেতো, পড়ার আগ্রহে নয়, সম্ভবত বিপরীত মেরুর আকর্ষণে। প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পর ক্লাস

করার আগ্রহ একেবারেই কমে তার জায়গা নেয় টিটি। এর নেশায় শেষমেষ ক্লাসে এনসি হয়ে পড়ি। ফলাফল পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের সময় ১০০ টাকা বাড়তি গচ্চা। সংক্ষেপণগুলো না বুঝলে আমার সাথে ই-মেলে যোগাযোগ করতে পারেন।

আরেকটা অদ্ভুত কাণ্ড, যার তাৎপর্য আমার কাছে বেজায় অস্পষ্ট। আমাদের সময় মাধ্যমিকের ফলাফল দেওয়ার পর কলেজে ক্লাস শুরু হয় সম্ভবত জুন-জুলাইয়ের দিকে। এরপর প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা হতো মে-জুনে। আর দ্বিতীয় বর্ষের শেষে টেস্ট ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। বর্ষ কিভাবে ছয় মাসে শেষ হয়, তা আমার মাথায় এখনো ঢোকে না।

অবশ্য স্যারেরা বা ছেলেরা কেউই এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতো না। কোন ক্লাসেই পাঠ্যসূচি শেষ হতো না। অথচ, ওই শিক্ষকেরাই যখন পড়াতেন, তখন সবাই ব্যাচে তিন-চার মাসেই পড়া শেষ করাতেন।

এধারা গঙ্গাসিন্ধুকাবেরীব্রহ্মপুত্রের মতো এখনও সমানে বহমান।

পড়া তো থোড়াই। নিজেরা যা পড়ি, তাই সম্বল। কিন্তু প্রাইভেট পড়ার যে মানসিকতা আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দেয়, তা নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারি।

জীববিদ্যা প্রাইভেটে পড়ি নি। আর, তারপর ভয়েই আমি অস্থির। অথচ, মাধ্যমিকের সময় অঙ্ক ছাড়া আর তেমন কোন বিষয় স্যারের কাছে পড়া হয় নি। আতঙ্কে বাবার কাছে থেকে হোমিওপ্যাথি খেতে হয়, এ্যাকোনাইট ন্যাপ ৩০। কিছুটা কাজ দেয়। একটা গাইড বই আর একটা সাজেশন সম্বল করে আশ্চর্যজনকভাবে ভালোই উৎরে যাই শেষ পরীক্ষায়। অথচ, উদ্ভিদবিদ্যা এতো ভাল করে স্যারের বাসায় পড়েও (এবং নিজে পড়েও) শেষ রক্ষা হয় নি।

কিন্তু, পরনির্ভরশীলতার ভূত আজও চেপে আছে ঘাড়ে। হোমিওপ্যাথির খুদে শিশিতে আর কী হবে!

নিশা লাগিলো রে...

এই প্রথম মেয়েদের সাথে ক্লাস-করা। তেমন কারোর সাথেই পরিচয় নেই। অথচ, ক্লাসমেট অনেককে দেখি মেয়েদের সাথে কী সাবলীল! না, ঈর্ষাও হয় না। কারণ, আমার রূপ এবং গুণ নিয়ে তখন আমার বেশ বাস্তবসম্মত ধারণা ছিলো।

আমার এক এমনি রমণীমোহন সতীর্থকে আপনারাও দেখেছেন। মনে আছে কি বাংলালিংকের সেই বিজ্ঞাপন যেখানে বিব্রত স্বামী অগত্যা স্ত্রীর মধুর অভিমান ভাঙাতে (এবং দরজা খোলাতে) অবশেষে রবীন্দ্রনাথের সেই মোক্ষম গানটি মোবাইলে পাঠান এবং অতঃপর তাহারা...?

তারা দুজনে আসলেই স্বামী-স্ত্রী। বন্ধুবরের নাম পলাশ দাশ। এখন অক্সফাম, দিল্লিতে কর্মরত। আর স্ত্রীটিকে তো আপনার অনেকেই চেনেন। অভিনেত্রী মৌটুসী বিশ্বাস (বোধহয়)।

শুধু দূর থেকে, পেছন থেকে তাদের দেখি। কারোর দু'গাছি চুল কপালের ওপর থেকে গালের পাশে এসে পড়েছে, ভালো লাগে। কারোর মুখের ধারালো গড়ন, ভালো লাগে। কারোর চেহারা আকর্ষণীয় (তখনো হুমায়ূন আহমেদের 'মায়াবতী' বিশেষণ তেমন বিস্তার লাভ করে নি), ভালো লাগে। আমি মূলত দর্শকই বটি। কলেজ শেষ করার পরও কারোর সাথে পরিচয় হয়ে ওঠে নি। আর আজ স্মৃতি হাতড়ে দেখছি, তেমন কারোর চেহারাই মনে নেই। আমার ব্যাচে আমায় মনে রেখেছে বা চিনবে এমন একজন মেয়েও পাওয়া যাবে না বলে আমি সুনিশ্চিত। এই কথা যখন আমার ছাত্র-ছাত্রীদের বলতাম, তারা হাওয়ায় উড়িয়ে দিতো, বিশ্বাস করতে চাইতোই না একদম।

আসল কথায় আসি। মজার ব্যাপার হলো আমি সেসময় আমাদের দু'জন সহপাঠিনীর প্রতি একসাথেই বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। এবং, দু'জনকেই পছন্দ করার একমাত্র কারণ ছিল তাদের নাক।

বিস্ময়করভাবে, দু'জনের নাক ছিল দু'রকমের। একজনের দারুণ ধারালো। আরো পরে, আমার এক সাহিত্যরসিক বন্ধু এক রমণীর নাকের বিবরণ দিতে গিয়ে বলবে, "তরকারি কোটা যায়", আর আমার বাক্যটি বড় পছন্দ হয়ে যাবে। অন্যজনের নাক বরং কিছুটা চওড়া। সে আমার সেকশনেই, অন্যজনকে দেখেছি পদার্থবিদ্যা পড়তে গিয়ে স্যারের বাসায়। পদার্থবিদ্যার ব্যাচে এর আগের দিন আমি ঝটপট বেশ ক'টা অংক করে একটু নজর কেড়েছি। এর পরদিন তাকে (ধারালো নাকেশ্বরী এবং তীব্র উজ্জ্বল বর্ণধারিণী) দেখে আমার সবক'টা অংক ভুল হয়ে যায়।

অন্যজনের কথা আর কি বলবো। গজগামিনী, মৃদুভাষিণী, বর্ণ কিছুটা চাপা, বাণী

বসু তাঁর এক উপন্যাসে এক নারী চরিত্রের গায়ের রঙের জন্যে এই বিশেষণটা ব্যবহার করছেন, 'নক্ষত্র-ফর্সা', মানে বাইরে থেকে দেখলে ততোটা না দেখালেও ভেতর থেকে যেন চাপা আলো ঠিকরে আসছে, স্তোকনম্রা (কসম আমার দ্বিতীয় ভালোলাগার, তখন এসব কিছুই চোখে পড়ে নি) ইত্যাদি ইত্যাদি...

তার নাকের ডগায় জমে-থাকা মৃদু স্বেদবিন্দুর পরিচয় নিতে আমি বড্ড উৎসুক ছিলাম। তখনো পড়ি নি রুদ্রের সেই লাইনগুলো, নইলে তাকে অন্তত জানাতে পারতাম তার "নাকের ডগার মিহি লোমে দূরতম স্বাতি নক্ষত্রের ঝ'রে পড়ার সুষমা" আমায় কতোটা বেভুল-ব্যাকুল করে রেখেছিলো। অথবা, হয়তো পারতাম না একেবারেই। কখনোই আসলে পারি নি, পরেও।

কোন এক বিচিত্র কারণে ছাত্রমহলে দু'জনেই দু'টি পাখির নামে পরিচিত। ধারালো নাসিকাধারিণীর নিক 'মুরগি' আর অন্যজনেরটি 'সারস'।

দ্বিতীয়জনেরটার কারণ জানি না, দু'একজনকে জিজ্ঞেসও করেছিলাম, উত্তর মেলে নি। তবে প্রথম জনের ক্ষেত্রে বলতেই হবে, আকিকাকারীর মেধা প্রশংসার্হ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে আমারও তাই মনে হতো মাঝে মাঝে তার নাকের কারণে। পরে জানতে পারি তার মেজাজের কথা এবং মেজাজের কারণে তার তুমুল বকবকানির কথা, যেকারণে তার এই নামকরণ।

যাক, আমার অবস্থাটা বলি।

একে তো স্রেফ দামড়াদের গোয়াল থেকে এখন বিরাট ডেইরি ফার্মে। তাই দ্রুত ভাইরাসের সংক্রমণ। সব মিলিয়ে সঙিন কাণ্ড। তাদের কাউকে দেখলে বুক-দুরুদুরু, তাদের কারোর কথা অন্য কেউ বলছে শুনলে কান খাড়া ও লাল, তাদের সাথে অন্য কেউ কথা বলছে, ঘুরছে, এমনকি তাদের বাসায় যাওয়ার কাহিনি শুনলে হক কথা শুনে আহাম্মকদের যেমনটা হয়- মন বেজায় বেজার।

কখনো আসা-যাওয়ার রাস্তায় (আমাদের বাংলা ক্লাস হয় মূল ভবনের চারতলায়, ইংরেজি হয় একতলায় বা দোতলায়, অংকও সেই ভবনেই, প্রায় শ'পাচেঁক গজ দূরে পদার্থবিদ্যা ভবন আর রসায়ন ভবন কাছাকাছি, আবার এদিকে জীববিদ্যা ভবন আরেকটু দূরে) দেখা হয়ে গেলে যেন হঠাৎ বৃষ্টি।

আর, আস্তে আস্তে যেমনটা হয়, সংক্রমণের লক্ষ্মণ হ্রাস পায়। অন্যদেরও দেখি, ভালো লাগে। আমি স্যারের বাসা থেকে বাসায়, আর নানান ধাক্কা খেয়ে-টেয়ে, না, পাক্কা হয়ে উঠতে পারি না, তবে রোগ থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠি।

আবারও বলি বিচিত্র। কারণ, দু'জনেই পরে চিকিৎসাবিদ্যায় পেশাদার হয়ে ওঠে।

সারসের সাথে পরে একবার দেখা হয়, মানে তাকে একবার দেখি। বিসিএস পরীক্ষা দিতে গিয়ে পরীক্ষাকক্ষ থেকে বের হওয়ার পর তাকে চোখে পড়ে। ফিগারটি বেশ ধরে রেখেছে সে, এতদিনে ওসব দেখার মতো আমার পুরুষশকুন চোখ হয়েছে বটে। পাশেই এক অনুগত, বোঝাই যায় স্বামী।

আমি মনে মনে আমার কলেজবয়েসী ঝাউবেলার বোকা আমি, অপরিপক্ব আমি, হাঁদারাম আমির পিঠ সস্নেহে চাপড়ে আমার রাস্তায় হাঁটতে থাকি বাস ধরার জন্যে। কখন পাখির বাসা থেকে পাখি উড়ে চলে গেছে তা আজ খালি বাসায় উঁকি দিয়ে বুঝতে পারি। বিকেলের মরা আলোয় পাখির ঝরা পালকগুলো বাউলে বাতাসে উড়ে উড়ে আমার চোখের আড়ালে চলে যায়।

পুনশ্চ: কত কথা ছিল মনে, কলেজের কত কথা, কথকতা। কিছুই বলা হলো না। বলা হলো না বন্ধুদের কাছ থেকে দু'টাকা ধার করে সিঙ্গারা খেয়ে গ্যাস্ট্রিক বাধিয়ে বাসা থেকে পাওয়া টাকা বাঁচিয়ে বই কেনার কাব্য; বলা হলো না সে-বন্ধুটির কথা যে জরিপ চালিয়েছিলো ছেলেদের মধ্যে সর্বশেষ কে কখন হস্তমৈথুন করেছিলো তা নিয়ে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে তার মাথায় জন্ম নেয় সেক্সমুক্ত সমাজস্থাপনের চিন্তা; বলা হলো না বন্ধুদের কলেজি প্রেমের সূত্রপাত, যা কখনো রূপ নিয়েছিলো পরিণয়ে; বলা হলো না সে দু'টো পাইন গাছের কথা, যেগুলোর নিচে বসে প্রায়ই আমরা আড্ডা দিতাম, আর শীতকালে মাঝেমাঝে পাইনের ফল (কোন) কুড়াতাম; বলা হলো না সেই চড়া মেজাজের উপাধ্যক্ষের কথা যাঁকে আসতে দেখলেই ছেলেরা পালাতো এদিকে-সেদিকে এবং কেউ কেউ ধরাও পড়তো; বলা হলো না বন্ধুর প্রক্সি দিতে গিয়ে আমার ধরা পড়ার কীর্তি এবং সেই বন্ধুসহ স্যারের পায়ে পড়ে সসম্মানে কান্নাকাটির বিরল প্রোফাইল; বলা হলো না যে...

...আমি আসলে কতোটা বুড়িয়ে গেছি, অথচ স্মৃতির সবুজ এ্যালবামের ছবিগুলো আজও মনে পড়ে, মনে থাকে, আর আমার হয়ে-ওঠার দিনগুলো আবার ফিরিয়ে আনে, মন মুচড়ে-ওঠার বিরক্তিকর অসহ্য অনুভূতিটা আবার বুকের ভেতর ধাক্কা দিয়ে যায়।

সচল নামঃ মহাস্থবির জাতক

সচল ঠিকানাঃ

http://www.sachalayatan.com/user/hillolsctg

ঘাস-মাটির দিন

...মোঃ তানভীরুল ইসলাম

কলেজের কথা ভাবতে বসলে কেন যেন আমার তেমন কিছু মনে পড়ে না। ধোঁয়া-ধোঁয়া ভসা-ভাসা যাও একটু আধটু মনে পড়ে, তাও একেবারেই টুকিটাকি, কেমন যেন হাবিজাবি সব। হয়তো কলেজ নিয়ে কিছুটা আশাভঙ্গ ছিলো, সে কারণেই। স্কুলে থাকতে কলেজ নিয়ে এক ধরণের কৌতুহল কাজ করত। কেমন হবে সেটা? কলেজে নাকি ইচ্ছে মত ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়? আরো কত কী!

আমাদের স্কুলটা ছিলো একেবারেই খোলা মাঠ। আসেম্বলি বছরে হতো দুয়েকবার। সব দিকে পাচিল টাচিলের বালাই ছিলো না পিছনের দিকে ছিলো ঢোলকলমী আর কঁচা গাছের বেড়া মাঝে মাঝে স্যাররা ক্লাস থেকে কাউকে পাঠাতেন সেই কঁচার ডাল ভেঙ্গে আনতে। কারণে অকারণে সেসব ডাল দিয়ে উত্তম-মধ্যম চলত। কখনো ডাল ভেঙ্গে আনতে গিয়ে সেই বান্দাই বেড়া পেরিয়ে দিতো ছুট। এসব মিলিয়েও ওখানে একটা প্রাণ ছিলো। একটা আপন লাগা ছিলো। সেই ইংরেজ আমলে বানানো বিল্ডিংএ এক ধরণের পাথুরে শীতলতা ছিলো শতবর্ষী মেহেগনি আর আম গাছ। স্কুলের সামনে গগন-চুম্বি পাকুড়। সামনের সত্যিকারের খোলা মাঠ। এগুলো ছিলো বিশালতার প্রতীক। ক্লাসরুমগুলো যেমন উচু তেমন বড়। ছোটো ছোটো মানুষগুলোর জন্য এ যেন একটা বড়ত্বের মহা আয়োজন। সব কিছু মিলে একটা দারুণ মায়ায় আটকে ছিলাম। কঁচার ডালের বাড়ি দিয়ে পিঠ ফালাফালা করে দিয়েছিলো যে সফিয়ার স্যার, সেই স্যারই বিদায়ের দিনে বুকে আগলে কেঁদেছিলো আমাদের সবার চেয়ে বেশি। এইসব মায়ার ক্ষত নিয়েই স্কুল ছেড়ে কলেজ জীবনে ঢুকে পড়ি আমি। যেন হঠাৎ করেই।

কলেজে প্রথম ঢুকতেই একটা ধাক্কার মত খেলাম যেন। এত পরিপাটি! সব কিছু এমন গোছানো! শ্যাওলা ধরা দেয়াল নেই, ঝরা গাছের পাতার নেই, বট-পাকুড়ের ঝুরি নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা পরিপাটি ইউনিফর্ম পরা। রীতিমত আসেম্বলি করছে! লেফট-রাইট-লেফট, লেফট-রাইট-লেফট। ক্যান্টমেন্ট কলেজ ছিলো সেটা। এখানেও বেশ বড় মাঠই ছিলো। সে মাঠে পাচিলও ছিলো। আর যেখানে পাচিল নেই সেখানে ছিলো বেড়া। না, ঢোলকলমি বা কঁচা গাছের বেড়া না, নিয়ম এর বেড়া। চারিদিকেই নিয়ম আর নিয়ম।

এত সব নিয়মের বেড়াজালে আটকা পড়লেও স্কুলের সাথে কলেজের কিছু পার্থক্য বেশ অবাকই করেছিলো। এখানে প্রতি ক্লাসে নাম ডাকে। কখনো কখনো দুই ক্লাসের মাঝে গ্যাপ থাকে। আমরা বলি গ্যাপ পিরিয়ড। স্কুলে এমন ছিলো না। স্কুলে আর যা ছিলো না তা হলো মেয়েরা। ক্লাসে অর্ধেকের বেশি মেয়েদের উপস্থিতি বড্ড অস্বস্তিতে রাখতো। ছেলেরা ততদিনে নতুন আগ্রহের বিষয় পেয়েছে। মেয়ে। গ্যাপ পিরিয়ডে চলত তাদের অবিরাম খুনশুটি। এসব টানতো না। বরাবরের মতই নিঃসঙ্গ আমি। ঘুর ঘুর করতাম কলেজের আনাচে কানাচে। কোনো শিক্ষকের সাথেও আত্মিক যোগাযোগ হয়নি কলেজে গিয়ে। আমার কলেজ স্মৃতি তাই সেইসব আনাচ-কানাচের স্মৃতি।

কলেজে মাঝারি আকারের পুকুর ছিলো দুইটা। তার একটার চারিধার জুড়ে আমলকির গাছ। সে গাছে তেতুল পাতার মত কুচি কুচি পাতা। কলেজে গিয়েই প্রথম আমলকি গাছ দেখি। প্রচুর বাতাবিলেবু গাছ ছিলো। লেবুর মৌসুমে পুরো কলেজের সবাইকে বাতাবি লেবু খাওয়ানো হতো। আর বিশাল জাম গাছ ছিলো দুটো। সাইকেল গ্যারেজের উপরে। জামের সময় পাকা জাম পড়ে গ্যারেজের মেঝে বেগুনী হয়ে থাকতো। জুতার নিচে মটমট করত জামের বিচি। কাঠাল ছিলো, আম ছিলো, ছিলো নারকেল-সুপারি সবই। সুন্দর করে ছাটা ঝাউ গাছ ছিলো। পরিপাটি পাতাবাহারের বেড়াও ছিলো মাঝে মাঝে মালীরা ডালিয়ার চাষও করত বেশ গুছিয়ে। তবে এসব গোছানো পরিপাট্যের কারণেই বোধহয় কেমন যেন সাজানো লাগত সব। এত সুন্দর কলাবতি-গাঁদা ফুলের হাসি দেখে অভিনয় বলে ভ্রম হত। ওদের সাথে তাই সেভাবে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি।

একবার শুধু বাংলা বিভাগের পাশে কেউ একটা দোলনচাপা আর কিছু রজনীগন্ধা লাগিয়ে দিলো। এদের ভালো লেগেছিলো খুব। এই দুই ফুলের সাথে আমার অনেকটা শৈশব জড়িয়ে আছে বলেই হয়তো। সে অবশ্য আরেক গল্প। হয়ত বলব অন্য কোথাও।

কলেজে সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক হয়েছিলো যাদের সাথে তারা হল ঘাস। নানান রকম ঘাস ছিলো সেখানে। মাঠজোড়া তাদের দারুণ দৌরাত্ম্য তাদের সাথে যুদ্ধ

করার জন্য ডেডিকেটেট দুজন লোকই ছিলো। আমি ওদেরবলতাম গ্রাসম্যান। ওরা মালী না। ঘাস কাটাই তাদের কাজ। সারা বছরই তাদের দেখতাম মটর চালিত ঘাস কাটার যন্ত্রটা নিয়ে সারা মাঠ চষে বেড়াচ্ছে। দুটো মাঠ ছিলো। আসেম্বলি হত এক মাঠে। আরেকটা ফুটবলের। আসেম্বলির মাঠটাতে আসেম্বলির যায়গা রেখেও আরো পৌনে দু খানা ফুটবল মাঠ ধরে যাবে অনায়াসে। দুই মাঠের ঘাস ছিল আলাদা। গ্রাসম্যান'রা ঘাস কেটে ফালিফালি করে ফেলত। মাঠগুলো তখন দেখতে হত বিশ্বকাপ ফুটবলের মাঠের মত। ঘাসের চেক চেক। মাঠে গেলেই তাই কাটা ঘাসের গন্ধ পাওয়া যেত। অনেকটা আখের রসের মত। কখনো দমকা বাতাসে সেই ঘাস-মাটির গন্ধই চলে আসতো ক্লাসরুমে। এক রকম মাদকতা ছিলো তার।

ক্লাসের ছেলে মেয়েদের সাথে মিশে যেতে পারিনি কখনোই। মেয়েদের সাথে ভয়ে। আর ছেলেরা এমনিতেই দলে নিতো না। ওদের সাথে আগ্রহের বিষয়-মাত্রা কোনোটাই মিলতো না বলেই হয়ত। ক্লাসরুমের পিছনে যে পুকুরটা ছিলো ওর ধারে মাঝারি আকারের একটা নারিকেল আর আম গাছের মাঝে তাই নিজের একটা জগৎ ছিলো আমার। দুর্বা ঘাস ছিলো যায়গাটাতে। পুকুর অন্য পাড়ে কিছুটা ফাকা যায়গা কলেজের। তার পরে তারকাটার বেড়া। আর তার পরেই ধু-ধু মাঠ। আখের চাষ হতো সেই মাঠে। শেয়াল ছিলো প্রচুর।

বোকা ছিলাম খুব। পুকুর ধারে দুর্বা ঘাসে বসে সবুজ রঙের একটা বই পড়তাম। ফিজিক্স। মাঝে মাঝে গল্পের বই। ভর দুপুরে সূর্যের আলো পুকুরের পানিতে ঝিকমিক করত। মাঠ পেরিয়ে আসা বাতাস পানিতে আলোড়ন তুললে সেই ঝিকিমিকিটা কেমন সুন্দর প্যাটার্নে পড়ে যেত। ফিজিক্স বইয়ের তরঙ্গ সমীকরণ মাথায় উকি দিত তখন। পুকুর পাড়ের পানি-কাদা অংশে কিছু শন গাছ ছিলো। এগুলোও তো একরকম ঘাস। তাদের লম্বা পাতা ঝুকে থাকত পানির মধ্যে। সেই পাতায় ধার ছিলো বেশ। একবার পানির ঝিকিমিকি দেখতে দেখতে বোকার মত শনের পাতায় ঠোট কেটে ফেললাম। আমার কলেজ জীবনের সবচেয়ে ঝলমলে স্মৃতি এই রুপোলি ঝিকিমিকির।

বছরের একটা সময় মাঠের ঘাসে ফুল হতো। সাদা ফুলে ছেয়ে যেত সারা মাঠ। তার পর ফুল ঝরে হতো বীজ। আমরা বলতাম ভাটই। তখন মাঠে হাটলে মোজা আর প্যান্টে ভাটই লেগে যেত। কুটকুট করে ফুটতো খুব। আমার বসার যায়গাটাতে যাবার পথেই প্যান্টের দফা-রফা। বসে বসে ভাটই খুটতাম। ভাটই'র মধ্যেও এক ধরনের ছোটো চাল থাকে। মাঝে মাঝে সেটার স্বাদ নিতে মুখেও পুরে দিতাম কিছু। এক রকম বদ অভ্যাসই ছিলো। সব সময় মুখের মধ্যে ঘাসের ডগা থাকতো দুয়েকটা। কলেজে এসে বসে বসে ঘাস খাচ্ছি। এটা ভেবে মজা লাগতো খুব।

আসেম্বলি মাঠের যে পাশে আসেম্বলী হয় তার বিপরীত পাশে দূর সীমানার দিকে একটা আম গাছ ছিলো। আসেম্বলীর ঘন্টা বাজার পরেও যাদের দেরী হতো আসেম্বলী শেষে এক দৌড়ে সেই আমগাছ ছুয়ে আসতে হতো তাদের। সবার শেষে যে পৌছাবে তার জন্য বেত্রাঘাত। সেই দূরের গাছ টাকে কেমন একা লাগতো। ধু-ধু মাঠের মধ্যে এভাবে একটা গাছ লাগানো কি ঠিক? বেচারার তো সরে আসারও কোনো উপায় নেই।

একবার আমারো দেরী হলো। প্রায় দশবারো জনকে তাই সেই রেসে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এক সময় এক ছুটে চলেও গেলাম গাছের কাছে। সবাই তখন গাছ ছুয়ে পড়িমড়ি করে ছুটে ফিরছে কলেজের মূল বিল্ডিংএর দিকে। একটা দূরবর্তী স্মৃতির মতো দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে যেন। আমার কী যে হলো। সেই একলা গাছটাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হলো না। বেত্রাঘাতের কথা ভুলে গুড়ির অন্য পাশে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

তবে মজার ব্যাপার হলো স্যাররা সেই ফিরে যাওয়া দলের শেষ ব্যক্তিকেই বেত্রাঘাত করে সবাইকে ছেড়ে দিলো। আরেক বান্দার যে কোনো খোঁজ নেই সে খেয়ালই রইলো না কারো। বোধ হয় অদৃশ্য মানবই ছিলাম। কলেজ জীবনে এটাই আমার সবচেয়ে মজার স্মৃতি।

সচল নামঃ স্পর্শ
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/sporsho_0

এই ছেলে দাঁড়াও

...সচল জাহিদ

তাড়াহুরো করে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ বিকট টাইপের হুঙ্কারের মত কিছু একটা শুনে দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনে যে দাঁড়িয়ে আছেন তার উচ্চতা কিছুটা আমার মতনই, পড়নে নরমাল প্যান্ট, গায়ে হাফ শার্ট, চোখে সানগ্লাস আর মুখে অসম্ভব গম্ভীরতা। এমনিতেই পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে গেছে। মিরপুর ১৪ থেকে এই আরামবাগে আসা কি সহজ কথা! প্রথমে বাসা থেকে রিকশা, পরে মিরপুর ১৪ থেকে মিরপুর ১০ এ হেলিকপ্টার (এক ধরনের টেম্পু), মিরপুর ১০ থেকে গুলিস্তানে দোতালা বাস, আর সবশেষে গুলিস্তান থেকে ছয় নম্বর ধরে তার পরেই না স্বাদের নটরডেম।

'হুয়াই আর ইউ স্যু লেট?'

'না স্যার মানে বাসে আসতে জ্যামে একটু দেরী হয়ে গেল, আমি আমতা আমতা করে জবাব দেই।

'নেক্সট দিন থেকে এটা যেন আর না হয়, কোন গ্রুপ? '

'জি স্যার, গ্রুপ টু'

'যাও সোজা তিন তালার ঐ পাশের শেষ রুমে চলে যাও', আমাকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে দিক দিয়ে এসেছি তার ঠিক বিপরীত দিকে।

আমি হাফ ছেড়ে বাঁচি, দৌড়ে তিন তালায় উঠে শেষ রুমটাতে যেয়ে দেখি দরজা বন্ধ। এক দুবার ধাক্কা দিতেই বুড়োমতন এক বিদেশী মানুষ অসম্ভব বিরক্তি নিয়ে দরজা খুলে দিয়েই বলে উঠল,

'পিছে যাও'

দি সোর্ড অফ টিপু সুলতান দেখে ফিরিঙ্গি স্টাইলে কথা বলাটা বেশ রপ্ত করেছি ততদিনে কিন্তু কলেজের প্রথম দিনে সেই স্টাইলে যে কেউ একজন পেছনে যেতে বলবে সেটা ভাবিনাই। যাই হোক আমি ভাবলাম সবাই আগে চলে এসেছে আমাকে বুঝি পিছনে বসতে বলছে। কিন্তু চেয়ে দেখি আমার মতন আরো কিছু কুতুব পেছনে দাঁড়িয়ে। আমার দেরি দেখে আবারো সেই একই নির্দেশ,

'পিছে যাও'

আমি পেছনে চলে গেলাম এবং দাঁড়িয়ে থেকে সারা ক্লাস উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিদ্যার গতি ও বেগের লেকচার শুনলাম।

প্রিয় পাঠক এই অবতারণা আমার কলেজ স্মৃতিকে রোমন্থন করবার জন্য নিজের কাছ থেকেই ধার করা। সেদিনের সেই অসম্ভব গম্ভীর টেরেন্স পিনোরো আজ পৃথিবীতে নেই, আর বুড়োমতন ফাদার পিশোতোও কোথায় আছে জানিনা। কিন্তু আজও তাদের কথা মনে পড়লে আমি চলে যাই সেই ৯৪ থেকে ৯৬ এর সেই দিনগুলিতে আনন্দময় নাকি বেদনাময় জানিনা তবে খুব দামি সেই সময়গুলো, হয়ত এই আজকের আমি সেদিনগুলোরই উপহার।

আমি মফস্বলের ছেলে, অন্য আর দশটা ছেলের মত টাংগাইলের অলিগলিতে চষে বেড়িয়েছি আমার স্কুল জীবনে। স্কুলে পড়ার সময় ইচ্ছে ছিল ঢাকা কলেছে পড়ব, সেই মতন প্রস্তুতিও নিচ্ছিলাম। তখন সবে ঢাকায় এসেছি, থাকি এক আত্মীয়র বাসায়। একদিন নিজেই চলে আসলাম আমার স্বপ্নের ঢাকা কলেজে। আস্তে আস্তে গেট দিয়ে ঢুকে হেঁটে বেড়াচ্ছি, আর মনে মনে ভাবছি আর মাত্র কটা দিন পরেই এখানে পড়ব। হঠাৎ একটা হট্টগোল দেখে পেছনে তাকাতেই দেখি দুইটা গ্রুপ মিছিল নিয়ে আসছে। নিমিষেই তাদের মধ্যে মারামারি লেগে গেল। পুলিশ বোধহয় আশেপাশেই ছিল, অবস্থা বুঝে টিয়ার গ্যাস মেরে দিল, শুরু হলো সবার এলোপাথারি দৌড়। আমিও কোন মতে দৌড়ে নিউমার্কেটের দিকটাতে চলে আসলাম, তারপর সোজা মিরপুর। নিজের স্বপ্নকে বলি দিতে একটুও দেরী হয়নি আমার, সেদিনই সিদ্ধান্ত নিলাম আর যাই হোক, ঢাকা কলেজে পড়বনা।

অগত্যা আমার আমার নতুন জীবন শুরু হলো নটরডেমে। টাঙ্গাইলে থাকার সময় নিজেকে মনে করতাম ভয়াবহ স্মার্ট অথচ সেই আমি কলেজে একগাদা ঢাকাইয়া ছেলের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করলাম আবুল হিসেবে। এই পোলাপানগুলি কিভাবে যেন কথা বলে, কি নিয়ে যেন আলাপ বলে আমি তার কিছুই বুঝিনা। ক্লাসে চুপ করে বসে থাকি আর টিফিন পিরিয়ডে টাঙ্গাইলে আমাদের স্কুল থেকে আরো যে কজন বন্ধু এসেছিল তাদের সাথে আড্ডা মারি। এভাবে চলল বেশ কিছু দিন। ততদিনে মিরপুর আরামবাগ করতে করতে আমার দফারফা শেষ, বাবাকে বললাম ঢাকায় বাসা নিতে। এমনিতেই কলেজের প্রথম পরীক্ষার ফলাফল দেখে বাবার

চোখ আকাশে উঠেছিল, তার উপর আমার কষ্ট দেখে তিনি তল্পিতল্পা সহ আম্মুকে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলেন। কলেজের কাছাকাছি শাহজাহানপুর হলো আমাদের মা ছেলের নতুন আবাসস্থল। আশে পাশে কলেজের বন্ধু পেলাম, কাছাকাছি কলেজের স্যারদের বাসা পেলাম, শুরু হল আমার নতুন জীবন, যে জীবনে টাঙ্গাইল রয়ে গেল স্মৃতিতে আর ঢাকা চলে আসল হৃদয়ে। আমি ধীরে ধীরে সহজ মফস্বল জীবনের বৃত্ত থেকে বের হয়ে কঠিন শহুরে জীবনে পদার্পণ করলাম।

সপ্তাহের পাঁচ দিন সকালে উঠে টেম্পুতে করে নয়াপল্টন যাই আর সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে আরামবাগ। ক্লাসের ফাঁকে জম্পেশ আড্ডা দেই, ক্লাসে মাঝে ছোট ছোট চিরকুটে করে বন্ধুদের মধ্যে খবর আদান প্রদান করি। কী থাকেনা সেই চিরকুটে, কখনো স্যারদের নিয়ে,

'আজকে মারলিন ক্লারা পিনোরোকে জোস লাগতাছে।'

'এই মুখতার সার আজকে কতবার চশমায় হাত দিলোরে?'

'জহর স্যার আজকে এখনো কেন কি হয় জানতে চাই বলে নাইরে!'

'ঐ কালকে জাইঙ্গারে কলেজের সামনে চটপটি খাইতে দেখছস?'

'পিটার গোমেজরে জিগা, হেই নিজে তপসে মাছ খাইছে নাকি?'

'ঐ অসিত স্যার ফয়েটসে খাইছে এইডা চাপা পিটতাছে নাতো?'

'অমল স্যারের বৃত্ত আকাটা দেখছস, জোস না!'

'সুশান্ত স্যার আজকে ৬৭ বার কও তো দেখি বলছে

কিংবা কখনো অন্য কিছু নিয়ে,

'কাইলকা ঢাকা ব্যান্ডের গানে মুখোশ পইড়া পেছনে কে কে ছিলরে?'

'ঐ চটিটা আনছস?'

টিফিন পিরিয়ডে বন্ধুরা দলবেধে ক্যাফেতে যাই, সিমেন্টের টেবিলে মাঝখানে ইট দিয়ে বেড়া দিয়ে টেবিল টেনিস খেলি, কিংবা কখনো আইডি কার্ড জমা দিয়ে বাস্কেট বলটা নিয়ে কিছুক্ষণ লাফালাফি করি। দুপুরের ঘুম জলাঞ্জলি দিয়ে কেমিষ্ট্রি ল্যাবে গ্যাস বানাই কিংবা লবণ মিলাই, অথবা ফিজিক্স ল্যাবে মুখ বুঝে ল্যাব ব্রাদার খ্যাত দুই বছরের সিনিয়র ভাইদের সামান্য কারণেই ল্যাব শিট ছেঁড়া দেখে আহত হই, জীববিজ্ঞান ল্যাবে চোখের সামনে একবীজপত্রী কিংবা দ্বিবীজপত্রী গাছ দেখে তা আঁকার নির্দেশ পেয়ে অবাক হই। কখনো মজিদ আর হাসুনির মাকে নিয়ে মুখতার স্যারের সস্তা হাস্যরস আমাদেরকে জীবন্ত করে তুলে, বিদ্যাসাগর সারের মাস্তান টাইপের কথাবার্তা আমাদের মুখে হাসি নিয়ে আসে, এসি দাসের বাজখাই গলায় 'তুমি কোন স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করতাছ' একই সাথে আমাদের কাউকে আনন্দিত আবার কাউকে বিব্রত করে। টি-তম সময়ে দূরত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'সরাসরি সুত্র ব্যবহার না করে গড় গতিবেগের কনসেপ্ট ব্যব্যহার করতে হবে'- ফাদার পিশোতোর এই নির্দেশ যেমন মানতে কষ্ট হয় তেমনি প্যান্টের পেছনে ছেঁড়া দেখে, কিংবা কয়েকদিন পরে সেই ছেঁড়া প্যান্ট সুতা দিয়ে ঠিক করা দেখে, অথবা পূর্ণ সূর্যগ্রহণের দিন নিজের হাতে ফিল্টার বানিয়ে সব ছাত্রকে সূর্যগ্রহণ দেখানোর মমতা দেখে তার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবোধ চলে আসে অজান্তেই।

'ভ্যানিটি' শব্দের মানে যে ফুটানি সেটা বুঝতে না পারায় কখনো সুশীল স্যারের ঝাড়ি খাই। আবার অসিত স্যারের মুখ থেকে লাঞ্চেয়নের সেই খাবারগুলির স্বাদের বর্ণনা শুনে জীবনে আর যাই না করি ফয়েটসে একবার লাঞ্চ করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেই। কখনো জহরলাল স্যারের নির্দেশে বীজগণিত বই না নিয়ে আসার জন্য আমরা ক্লাসের অধিকাংশ গাধা কানে ধরে বেঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে থেকে ভাবি এখনো কিন্ডারগার্ডেনে পড়ছি কিনা, আবার সেই একই কারণে জাইঙ্গা খ্যাত জাহাঙ্গীর কবির যখন ক্লাস থেকে বের করে দেয়, তখন আমরা আমোদিত হয়ে যারা ইংরেজী বই এনেছি তারাও মিথ্যা বলে ক্লাসের বাইরে চলে গিয়ে ক্রিকেট খেলি। এই আমরাই আজমল স্যারের মুখে ভিকারুন্নিসার মেয়েদের প্রশংসা শুনে বিরক্ত হই। আবার অমল স্যারের বাসায় প্রাইভেট পড়া শেষ করে সেই ভিকিদের খোঁজেই একটু বেইলি রোড চষে আসি, বাড়তি হিসেবে থাকে ফিরতি পথে কোন বন্ধুকে বাঁশ দিয়ে সুইসের বারগার খাওয়া।

আমাদের 'এইম ইন লাইফ'গুলিরও পরিবর্তন হয় কলেজের দিনগুলির সাথে। স্কুলজীবনে ইচ্ছে ছিল পদার্থবিদ হবো। অথচ কলেজে এসে পিশোতোর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা আর ইংরেজি মেশানো পদার্থবিদ্যা দেখে এতই ভয় পেলাম যে সিদ্ধান্ত নিলাম ওমুখো হবোনা। আবার ফিজিক্স ল্যাবে ল্যাব ব্রাদারদের অত্যাচার সহ্য করেতে না পেরে নিজের 'এইম ইন লাইফ' ঠিক করেছিলাম ল্যাব ব্রাদার হবো। দেখা গেলো

বায়োলজি ল্যাবে ব্যাং কিংবা কেঁচো নিয়ে কাঁটাছেঁড়া তো ভালই করি তাহলে বাবার স্বপ্নকে সফল করতে ডাক্তার টাক্তার হব নাকি? পরমুহুর্তে ভুইঞা স্যারের চাপাবাজি দেখে তাতে ক্ষান্ত দেই। নিমাই স্যারের গণিত নিয়ে হাবভাব কিংবা কার্তিক স্যারের সহজাত সারল্য কোনটাই আমাকে গণিতের দিকে টানেনা তবে ক্যাসেটে শোনা প্রমীলা ম্যাডামের রবীন্দ্রসংগীত কিংবা তার রাবীন্দ্রিক ঢঙ্গে কথা বলা আমাকে রবীন্দ্র রচনাবলী পড়ার দিকে আগ্রহ এনে দেয়।

এভাবেই কাটে একেকটা দিন, সময় আসে চলে যাবার। ধীরে ধীরে একসময় নটরডেম হারিয়ে যায় আমার প্রাত্যহিক জীবন থেকে। কিন্তু তার রেশ হয়ে যায় সবসময়। আজও আড্ডায় বসে কলেজের অনুজ বা অগ্রজদের আসরে ঘুরে ফিরে মুখতার, জওহর, অমল, বিদ্যাসাগর, আজমল, সুশীল, টেরেন্স- এই নামগুলি আলোচিত হয়। আমরা আবার ফিরে যেতে চাই সেই দিনগুলিতে যাকে একসময় খুব বিরক্তিকর মনে হত। হয়ত সেই দিনগুলি পুরো জীবনের কাছে খুব ক্ষুদ্র কয়েকটা মাস। কিন্তু শাসন-বারণ আর বাঁধভাঙা কৈশোরের দ্বৈরথে চমৎকার কিছু সময় যা রোমন্থন করে আজও পুলকিত হই, হয়তোবা হবো আজ থেকে অনেক বছর পরেও।

সচল নামঃ সচল জাহিদ
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/socol_zahid

লেজ গজানোর দিনগুলি

...জি.এম.তানিম

কোথায় যেন পড়েছিলাম, কলেজ হলো সেই জায়গা যেখানে গেলে মানুষের লেজ গজায়। একটা দুটো নয়... গুনে গুনে ন'লেজ যাকে বলে। তারপর সেই ন'লেজের বদৌলতেই বাকিটা জীবন চড়ে বেড়ায়। এক দশকের স্কুল জীবন আর অর্ধ দশকের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের মাঝে টেনে টুনে বছর দেড়েকের কলেজ জীবন তাই স্যান্ডুইচের মাঝে সালামির মতন, প্রস্থে কম হলেও স্বাদে নয়।

নটরডেম কলেজের কথা প্রথম শুনি জনি ভাইয়ার কাছ থেকে। জনি ভাইয়া আমার ফুপাতো ভাই, দুই বছরের সিনিয়ার। ভীষণ ভালো ছাত্র, ঢাকা ভার্সিটি বায়োকেমিস্ট্রিতে প্লেস পাওয়া। স্কুল থেকেই ওনার কাছে পড়া বুঝে নিতাম। পড়ার রুটিনটা ছিল এমন, ওনার বাসায় যেতাম গণিত বা ফিজিক্সের কয়েকটা অংক করতাম, কেমিস্ট্রির কিছু কঠিন সূত্র আর বিক্রিয়া বুঝে নিতাম তারপরে টিভি খুলে এইচবিওতে মুভি কিংবা খেলার চ্যানেলে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথ। উনি যখন পড়তেন নটরডেমে, তখন থেকেই মুখতার স্যার, নিমাই স্যার এঁদের গল্প শুনতাম। ওনাদের সময় নটরডেমের ৫০ বছরপূর্তি হয়, এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বর্ণনা শুনি ভাইয়ার কাছ থেকে।

এভাবে ভাইয়ার কাছে শুনতে শুনতেই মনের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এই কলেজে পড়তে হবে। এমনকি কলেজে ভর্তির পরে ওনার মতই পরিসংখ্যান নিয়ে পড়া শুরু করি গ্রুপ সেভেনে। ওনার কাছে শুনেছিলাম গ্রুপ সেভেন সব সময় যেন অনেকের মধ্যে থেকেও একটা আলাদা রূপ পেয়ে থাকে, পরবর্তীতে নিজের চোখেও সেটা দেখা। একটা মজার ব্যাপার শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছি না গ্রুপ সেভেনে আমার আর ভাইয়ার রোল একই ছিল। ৭ ডিজিটের নম্বরে কেবল পার্থক্য ছিল বছরের সংখ্যাটি, ওনার ০০, আমার ০২।

নটরডেম কলেজ। বছর দশেক আগের কোন একদিন প্রথম পা রেখেছিলাম তার প্রাঙ্গণে। কলেজে ঢুকতেই প্রথম নজরে পড়লো বিশাল সেই মাঠ। আমার স্কুল মাঠের অন্তত তিনগুণ হবে। দারুণ পছন্দ হলো। মিশনারি স্কুল থেকে গিয়েছিলাম, তাই নিয়ম শৃংখলাটা ঠিক নতুন না হলেও অনেক দারুণ লেগেছে। হয়তো কোথাও কোন কিছু বিলি হবে, অথবা কিছু জমা নেওয়া হবে। ছাত্ররা নিজেরাই একটা লাইন করে ফেলত। পরবর্তী সময়ে জীবনের অন্য ধাপগুলোতে এটার অনুপস্থিতি অনেক চোখে লেগেছে।

কলেজে উঠে আমার একটা খুব ভালো অভিজ্ঞতা হলো নিয়মিত এক লাইনের বাসে যাওয়া আসা। স্কুল বাসার কাছে ছিল সব সময়ই, তাই রিকশাতেই যাওয়া আসা করতাম। কিন্তু কলেজ তো ঢাকার অন্য প্রান্তে, সেই মতিঝিল। বিআরটিসির বাসে দেখা যেত দল বেঁধে বন্ধুরা যেতাম। প্রায়ই দেখা যেত দুপুরের প্রচণ্ড গরমে বাসের ফ্যান চলছে না। জিজ্ঞেস করলে সবসময় জবাব আসত ফ্যান নষ্ট। এক বন্ধু একদিন এই জবাব শুনে ফ্যানের উপরের ঢাকনি খুলতে শুরু করে দিল। কন্ডাকটর দৌড়ে এসে জিজ্ঞেস করে ঘটনা কী? তার নিস্পৃহ জবাব, ফ্যানই যখন নষ্ট তখন লাগিয়ে রেখে কী লাভ? এতে অবশ্য পরের দিকের দিনগুলিতে ফ্যান ছাড়তে বলায় না শুনতে হয়েছে খুব কমই।

কলেজের শিক্ষকদের কথা বলতে গেলে প্রথমে মনে পড়ে নিমাই স্যারের কথা। কী দারুণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলতেন! গণিতের ক্লাস মানে যে কেবল স্যার এক দিক থেকে বোর্ডে অংক করে যাবেন, আর ছাত্ররা খাতায় টুকবে- এটা নয়; গণিতের সুর বোঝার যে ব্যাপারটা, ওনার ভাষায় "উপলব্ধি করা"টাই যে আসল সেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। পাশাপাশি সমকালীন অনেক ঘটনা নিয়ে আলাপ আলোচনা করে মাতিয়ে রাখতেন ক্লাসটিকে। দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার পরে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের কারণে যখন ওনাকে আমাদের ক্লাস থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো, তখন আমাদের পুরো শ্রেণীর বেয়াড়া হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ ছিল এটা। বেয়াড়াগিরির বর্ণনা আসছে একটু পরে।

কলেজের শিক্ষকদের একেকজনকে মনে আছে একেক কারণে। সব এক জায়গাতে লিখতে গেলে তার আকার ভীষণ হয়ে যাবে তার থেকে এক নিঃশ্বাসে তাদের যে যে কারণে মনে আছে সেটা স্মরণ করে যাই। এক নিঃশ্বাসে কথা বলার কথা মনে পড়ায় মনে পড়লো গুহ স্যারকে। ভীষণ দ্রুত কথা বলতেন। ক্লাসে এসেই বোর্ডের এমাথা থেকে ওমাথা লিখে যেতেন। কপি করার খুব সামান্য সময় দিয়েই আবার লিখতে থাকতেন। রসায়নের মতন বিশাল সিলেবাস বছর দেড়েকে কীভাবে শেষ করলেন, এখনও বিশ্বাস হয় না।

মারলিন ম্যাডাম খুব শান্ত ভাবে কথা বলতেন। ক্লাসের ছাত্ররা অনেক সময় নিজের মতো কাজ করতো, সেটায় বাধা দিতেন না, মানে কেউ ক্লাসে সমস্যা না করলে। ওনার একটা কথা মনে আছে, উনি বলেছিলেন, "প্রতিটা মানুষের জীবনেই একজন বনলতা সেন থাকে, যে দু'দণ্ড শান্তি এনে দিতে পারে। সেটা হতে পারে বন্ধু কিংবা প্রেমিকা কিংবা অন্য কেউ। কিন্তু কখনও যদি মানুষটা জেনে যায় যে সে-ই বনলতা সেন, তখন সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়।"

মনে পড়ছে জাহাঙ্গীর স্যারের অদ্ভূত সব অভিব্যক্তির কথা, তার সেই "নীল বই"য়ের কথা কিংবা মাদার ইন ম্যানভিল পড়ানোর সময় তার বহুল ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ "হাই ইন ক্যারোলিনা মাউন্টেন" আর "মাদারলি লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন" এর কথা। টেরেন্স স্যারের ভরাট সে কণ্ঠ, আমাদের পড়িয়েছিলেন "গিফট অব দ্য মেজাই", ভালোবাসার সে এক অদ্ভূত রূপ আমরা শুনেছিলাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো। সুশান্ত স্যারের "কও তো দেখি?", মুখতার স্যারের "কপিলা" কিংবা জওহরলাল স্যারের "বদমাইশ" ডাক শুনে শুনে আর গুনে গুনে পার হয়ে গেছে দিনগুলি, অথবা ফাদার বেনাসের সাথে নাম ডাকার সময় সমস্বরে "ইজ অ্যাবসেন্ট" বলে চিৎকার করে। চুপচাপ ছিলাম দেখে শিক্ষকদের নজরে পড়ি নি তেমন, কিন্তু ওনাদের কাছ থেকে যা পেয়েছি তা বয়ে চলেছি আজও।

এবারে আমাদের সময়ের লেজবিশিষ্ট পোলাপানের কিছু কার্যকলাপের বর্ণনা দেই। পরিসংখ্যান ক্লাস হতো ছোট্ট একটা রুমে, দোতালায়। আমাদের সিনিয়র পরিসংখ্যানের স্যারের বদলে এলেন একেবারে নতুন একজন। ক্লাসে তাই নতুন উৎপাত শুরু হলো, মিসাইল নিক্ষেপ। তবে পুরোটাই সনিক। অর্থাৎ ক্লাসের একদিকে মিসাইল লঞ্চ হতো সাঁই করে... আর অন্য দিকে সেটা গিয়ে পড়তো বুম করে, শব্দগুলো মুখে মুখে করা সেটা বলাই বাহুল্য। এই বোমার উৎপাত পরে আমাদের মূল ক্লাসরুমেও ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া আমাদের আরেকটা প্রিয় কাজ ছিল মুখ দিয়ে হুমমমম কিংবা হিসসসস শব্দ করা, মাঝে মাঝে জুতো ঘষে একই রকম শব্দ করা। শ'দেড়েক ছাত্র একসাথে যখন শুরু করতো এটা, কেমন শব্দ হয় সেটা না শুনলে বিশ্বাস হবে না। এরকম একদিন একজন সাবস্টিটিউট শিক্ষকের ক্লাসে শব্দ হচ্ছে। স্যার সবাইকে কান ধরে বেঞ্চের উপরে দাঁড় করিয়ে দিলেন। স্কুল লাইফে হয়তো অনেকের লজ্জা হতো, কলেজে এমন শাস্তি পেয়ে সবাই যেন আনন্দে আত্মহারা, কে কার আগে বেঞ্চে উঠবে। পিছনে অতি উৎসাহী কয়েকজন বেঞ্চ তুলে তুলে ছেড়ে দিতে শুরু করল মেঝেতে। বিকট সে শব্দ। নটরডেমের যারা, তারা হয়তো জানেন, গ্রুপ সেভেনের নিচেই প্রিন্সিপালের রুম। এসবের ফলে যা হলো প্রিন্সিপাল স্যার এসে পুরো ক্লাসকে শাসিয়ে গেলেন একদিন।

নটরডেমে প্র্যাক্টিকালের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করা হতো। পদার্থ বিজ্ঞান প্র্যাক্টিকালে দুইজন প্রাণপণে রিডিং নিয়ে যেত, দুই জন করতো ঝগড়া আর বাকি দুইজন সোনালি বেন্দ্রেকে নিয়ে আলাপ করতো - দিনের শেষে এই দুইজনই বুঝতে পারতো যে রিপিট খাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাই ব্যাগ থেকে চোথা বের করতো। কেমিস্ট্রি ল্যাবে ল্যাব ব্রাদারদের ঝাড়ি খাওয়ার মাঝে মাঝে লবণ মেলানো ছিল দারুণ মজার ব্যাপার। এরই এক ফাঁকে একদিন নিজের বোকামির জন্যে উত্তপ্ত গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ছিটকে এসে কনুইয়ের কাছটায় পড়লে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়। যে ল্যাব ব্রাদার ঝাড়ির উপরে রাখতেন, তিনিই এসে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে বলেন, বার্নল লাগিয়ে দেন।

আজকে ভাবতে গিয়ে দেখি হাতের কাছটায় আবছা মতন যেই স্মৃতিটি এঁকে গেছে সেদিন, তার থেকেও অনেক গভীর দাগে ভরা কলেজের সেই সব দিনগুলি।

সচল নামঃ জি.এম.তানিম
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/gmtanim_0

যে দিনগুলো সাঙ্গ হল ঝড়বাদলের জলে

...রাফি

০০

স্কুল কলেজের বাংলা পরীক্ষায় আবশ্যিকভাবে একটা মেগাসাইজ রচনা লিখতে হয়; গড়পড়তা সব টিচারই যার পাতা গুনে নাম্বার দেয়। প্রস্তুতি নেয়ার ঝামেলা পোষায় না বলে রচনার ক্ষেত্রে বায়বীয় বিষয় আমার বরাবরই বেশ পছন্দের ছিলো; নির্বাচনী পরীক্ষায় লিখেছিলাম আমার কলেজ জীবন। কলেজের শেষ পরীক্ষায় বসে কলেজ জীবন নিয়ে রচনা লেখা যে আসলে কঠিন তা ভালোমতোই বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন।

কলেজ জীবনরচনায় ভালো নম্বর পেতে বর্ণনায় দরদের একটু বাড়াবাড়ি প্রয়োজন; কলেজ থেকে কত গূঢ়বিদ্যা লাভ করলাম তার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক; কলেজ জীবন থেকে অর্জিত এইসব মহান বিদ্যা ভবিষ্যতে আমার জীবনকে কীভাবে এবং কত দ্রুত নরকের দিকে নিয়ে যাবে তার বিশদ যৌক্তিক আলোচনা কাম্য। দুবছর জান কয়লা করে পরীক্ষার হলে বসে এর কোনটাই মাথায় আসছিলো না। বিশ্বাসযোগ্যভাবে কিছু সত্য-মিথ্যা লিখে খাতা ভরিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, নম্বর পাওয়া বলে কথা। তবে আজকে কলেজ লাইফ নিয়ে লিখতে গিয়ে অনেক কিছুই মনে পড়ছে, বেশিরভাগই হয়তো অনেকের কাছে তুচ্ছ আর অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে; তবু আজ লিখবই।

০১

কলেজের প্রথম দিনটা এখনো মনে আছে, ১৯শে আগষ্ট, ২০০১। তল্পি-তল্পা সহ দিনতিনেক আগে ঢাকায় এসে নতুন সংসারের নানান হাঙ্গামা মোটামুটি সামলে উঠে সেদিন সকাল আটটা বাজার কয়েক মিনিট আগে ওরিয়েন্টেশনে গেলাম ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে। ওরিয়েন্টেশন হলো, সারা কলেজ ঘুরিয়ে দেখালো সিনিয়ররা। ফ্যাঁকড়া বাঁধল মেসে ফেরার সময়। চৌরাস্তার পুলিশবক্স ডানে রেখে ক্ষুধা নিবারণ হোটেল এর পাশ ঘেঁষে আরামবাগের ভেতরে ঢুকে আমি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেলাম; এমনিতেই রাস্তা এবং মানুষের চেহারা ভুলে যাওয়ায় আমার সুনাম আছে; খেয়াল করলাম সুখ্যাতির প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে আমি আমার মেসের গলি ভুলে বসে আছি। এখন কেমন হয়েছে জানি না, তবে সে সময়ে ক্ষুধা নিবারণের সে গলি ধরে ডানদিকে মোড় নিলে হাতের বাঁয়ে যে গলিগুলো পড়ে তার সবই সমসুরত এবং সমপ্রস্থবিশিষ্ট ছিলো। মুঠোফোনের সুবিধা তখনো পকেটস্থ হয় নি; সুতরাং আধঘণ্টা শঙ্কিতচিত্তে ট্রায়াল এণ্ড এরর চালিয়ে অবশেষে যখন মেস খুঁজে পেলাম তখনকার আনন্দের কাছে নটরডেমে চান্স পাওয়ার উচ্ছ্বাসও ছিলো নস্যি।

ক্লাশ শুরু হল নিয়মিত। গ্রুপ থ্রি'তে ঠাঁই হলো আমার; প্রথম দিন ক্লাশে ঢুকে চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম। গ্রুপ মানে ১৬০ জনের দঙ্গল; পুরো ক্লাশ গমগম করছে। গ্যালারি ক্লাশ দেখলাম জীবনে সেই প্রথমবার; ক্লাশে গোলমালপ্রবণ গ্রুপ ঠেকানোর জন্য প্রত্যেকের সিট নির্দিষ্ট করা অভিনব আসন ব্যবস্থা। জানের দোস্তের সাথে ফিসফাস করে পিরিয়ড পার করে দেবার কোন কায়দা নেই; সিট চেঞ্জ করার কোন অপশনও নেই। নির্দিষ্ট রো'তে (এই জিনিসটা আজো পরিষ্কার না, নটরডেমে ভার্টিক্যাল লাইনগুলোকে কেন রো বলা হয়!) তুলনামূলক উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে সিট আগানো-পেছানো হতে পারে কেবলমাত্র।

একে স্যারের নাকের ডগায় বলে নড়বার জো নেই; অন্যদিকে সিনিয়র ভাইদের কাছে শুনেছি নটরডেমের যা মজা নাকি এই শেষের দিকের রো'গুলোতেই হয়। তাই সামনের দিকের সিটটা আমার ঠিক মনে ধরছিলো না; ক্লাশ শুরুর তিনদিনের মাথায় পাশের সিটের পোলার সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে এবং দিন দুয়েক ক্লাশ কামাই দিয়ে একেবারে লাস্ট বেঞ্চে স্থান করে নিলাম। যাকে বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দুবছরের সারাটা সময় সেখানেই কেটেছে।

০২

বাইরে থেকে যেমন শোনা যায়, নটরডেমের পড়াশোনাটা আসলে ততটা নিরানন্দ নয়। নারী বিহীন ক্যাম্পাস পানসে লাগে সত্যি কিন্তু আনন্দ যথেষ্টই আছে। সবচেয়ে বেশি আনন্দ প্রতিটি ক্লাশে স্যারদের নাকানিচুবানি খাওয়ানো; কারণে অকারণে জ্বালানো। পুরো ক্লাশটা যদিও একেবারেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউণ্ড আর

অপরিচিত ছেলে দিয়ে ভর্তি; দুষ্টামি করার সময় সব একাট্টা, একাত্মা। ফ্লোরে পা ঘষাঘষিতে কখনো ছন্দপতন হয় নি, কখনো কেউ একটা টোকা দিয়ে বসলে প্রতিটা বেঞ্চেই প্যারেডের আর্মির বুটের মতো একতালে কলমের ঝিমধরা টোকা শোনা যেত; আলাদা করার উপায়ই ছিলো না কোনদিক থেকে আসছে শব্দটা। শ'দেড়েক ছেলে খাতার এক পাতায় আরেক পাতা দিয়ে মৃদু ঘষলে যে কী অসহ্য একটা আওয়াজ হয় নটরডেমে না পড়লে তা কখনো জানা যাবে না।

নটরডেমে প্রথম ক্লাশ ছিলো গণিতের; জওহরলাল স্যারের, যিনি পরে হয়ে উঠেছেন জীবনের প্রিয়তম শিক্ষক। প্রথম দিন ক্লাশে এসেই হাঁপাচ্ছিলেন; কথার চেয়ে মাইক্রোফোনে উনার হাঁপানোর শব্দই শোনা যাচ্ছিলো বেশি। তখন অবাক হলেও পরে বুঝতে পেরেছি উনার বাচনভঙ্গিটাই এমন। ছাত্রদের সম্বোধন করতেন স্যার বলে, বেশিরভাগ সময়ই আপনি করে বলতেন। পান খেতেন আয়েশ করে; পোশাকের ব্যাপারে ছিলেন বাতিকগ্রস্ত। আমাদের না থাকলেও উনার একটা কলেজ ইউনিফর্ম ছিলো; সাদা শার্ট, কালো প্যান্ট। দিনের পর দিন এই ড্রেসে নির্বিকারভাবে ক্লাস করাতেন। প্রচণ্ড শীতের সময়ও স্যারকে এই পোশাকে দেখেছি। দুইবছরের কলেজ জীবনে শুধু একদিন দেখেছিলাম সাদা শার্টের উপর একটা হাফহাতা নীলচে সোয়েটার চাপিয়ে এসেছেন। আসলে নটরডেমে ইউনিফর্মের ব্যাপারটা আমরা খুব মিস্ করতাম। নটর ডেম বলে কথা; একটা ভাব আছে না! রাস্তায় বেরোব, লোকে নটরডেমিয়ান বলে একটু আলাদা খাতির-যত্ন করবে, একটু হিংসার দৃষ্টিতে তাকাবে। কোথায় কী? আমরা পাশ করে আসার পর কলেজ আইডি ঝোলানো নিয়ম চালু করেছে; শুধু কলেজ চত্বরেই নয়, সেই আইডি নিয়ে ছোটো ভাইদের দেখি পুরো ঢাকা শহরই ঘুরে বেড়াতে। ইউনিফর্ম না পড়তে পারার দুঃখটা হয়তো এরা এভাবে পুষিয়ে নিয়েছে।

ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে পড়ানো হয় বীজগণিত আর ত্রিকোণমিতি। ক্লাশে ঢুকেই জওহর স্যার চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'স্যার, আপনারা দুই অঙ্কে (মাধ্যমিক গণিত আর উচ্চতর গণিত) এ প্লাস নিয়ে আসছেন এর মানে হলো আপনারা যোগ বিয়োগটা পারেন। আমি আপনাদের গুণ ভাগ শিখাবো'। প্রথমদিন অবজ্ঞার হাসি হাসলেও কথাটার মর্মার্থ বুঝেছিলাম ফার্স্ট ইয়ারের শেষের ক্লাশটেস্টে। নিরীহ দর্শন পাঁচটা অঙ্ক দিয়ে গণহারে ফেল করিয়ে স্যারের সে কী মুচকি হাসি।

আমাদের চোখে স্যারের সবচেয়ে বড় দোষ ছিলো অহেতুক নীতিকথা আওড়ানো। মিনিটে মিনিটে নানা প্রসঙ্গে নীতিকথার ঝড় বইয়ে দিতেন। তবে পড়া বোঝাতেন অনেক আন্তরিক ভঙ্গিতে; মাথায় ঢুকে যাওয়ার ক্ষমতা ছিলো উনার। কতদিন ক্লাশে পড়বো বলে সেবার বই নিয়ে গিয়েছি, স্যারের কথার প্যাঁচে পড়ে গণিতের ক্লাশে সে বই বের করাই হয় নি। জীবনে যতটুকু ম্যাথ শিখেছি তার প্রায় সবটাই জওহরলাল স্যারের অবদান। উনার আর একটা বদভ্যাস ছিলো কথায় কথায় সংজ্ঞা বলা। 'অঙ্ক বলতে কী বুঝি?'; 'সংখ্যা বলতে কী বুঝি' এই জাতীয় ছেলেমানুষী প্রশ্ন করতেন সারাক্ষণ। আর মনের মাধুরী মিশিয়ে তার উত্তরও দিতেন। কথায় কথায় বলতেন 'স্যার, আমরা অংকে এ প্লাস পাই কিন্তু অঙ্ক বুঝি না। আমরা অঙ্ক পারি, কিন্তু বুঝি না। আমরা খালি বুঝি এই বইয়ের ষোল নম্বর আর ঐ বইয়ের আঠারো নম্বর অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট। পরে দেখা যায় দুইটা অঙ্ক একই।' স্যারের সংজ্ঞাভিত্তিক প্রশ্নগুলোকে সিরিয়াসভাবে না নিয়েও উপায় ছিলো না; গণিত ব্যবহারিক পরীক্ষার ভাইভায় তিনি থাকলে অবধারিতভাবেই এই প্রশ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি হত।

জেলা শহর থেকে এসেছি বলে ঢাকার বড় স্কুলের ছেলেদের প্রতি আমাদের একটা বিস্ময়বোধ কাজ করত প্রথম প্রথম। সেই জিজ্ঞাসায় স্যারই আলো ফেলেন। পছন্দ করতেন আইডিয়াল স্কুলকে আর চরম অপছন্দ সেন্ট জোসেফদের; অর্থহীন অপছন্দ যাকে বলে। ফার্স্ট ইয়ারের শেষের দিকে এক ক্লাশে বাঁদড়ামি করে এক বেচারা ধরা খেল; স্যার তার ট্রেডমার্ক ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই তুমি কোন স্কুলের ছেলে (টানটা আসলে লিখে বোঝানো সম্ভব না, যারা ক্লাশ করেছে শুধু তারাই ধরতে পারবে যে ছেলে শব্দের লে'কে স্যার কত সুরেলা উচ্চারণ করতেন)'। মাইকেল বলল সেন্ট জোসেফ। স্যার বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হুমম্...অ্যাই সেন্ট জোসেফের কারা কারা আছো?' জনাদশেক গর্বিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো। স্যার বিরক্ত ভঙ্গিতে দরজা দেখিয়ে বললেন, 'সব ক'টা বেরিয়ে যাও। ক্লাশ জুড়ে অট্টহাসি পিছনে রেখে বেচারারা মুখ চুন করে বেরিয়ে গেল। পুরো ফার্স্ট ইয়ার তাঁর ক্লাশ করেছি; সেকেণ্ড ইয়ারে উনার বদলে এসেছিলেন বিদ্যুৎ কুমার ভদ্র। নামে ভদ্র হলেও ভদ্রলোক মোটেও ভদ্র ছিলেন না; যথেষ্ট জ্বালিয়েছেন। তবে সবমিলিয়ে ম্যাথের টিচারদের প্রতি মুগ্ধতা রয়ে গেছে এখনো।

জীববিজ্ঞানে ক্লাশ পেয়েছিলাম সবমিলিয়ে তিনজনের; অমলকৃষ্ণ বণিক, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া আর গাজী আজমল স্যার। বণিক স্যার স্মরণীয় হয়ে থাকবেন উনার

অতুলনীয় কণ্ঠস্বরের জন্য; আজমল স্যার তার লেখা বইয়ের জন্য। যে বই সারাদেশের লোক পড়ছে, মুখোমুখি তার ক্লাশ করছি এ ব্যাপারটা আমাকে নাড়া দিতো তখন। তবে যে রকম জ্ঞানী কল্পনা করেছিলাম, কাছ থেকে দেখে কিছুটা আশাভঙ্গের মতো হয়েছিলো। নটরডেমের সবচেয়ে বর্ণিল চরিত্র ছিলেন ভূঁইয়া স্যার; এমন কিছু নেই যা এই লোক জানতেন না অথবা দাবি করতেন না যে তিনি জানেন। হোমিওপ্যাথি থেকে শুরু করে স্পোকেন ইংলিশ, নেচার স্টাডি, সাইকোথেরাপি, মার্শাল আর্ট সবই ছিলো তার ঠোঁট-দর্পণে। মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনের যুগে নিজের বিজ্ঞাপন কিভাবে করতে হয় তার একটা জ্বলজ্যান্ত বিজ্ঞাপন ছিলেন ভূঁইয়া স্যার।

রসায়নে মনে থাকবে বিদ্যাসাগর মল্লিক স্যারের কথা। অসাধারণ রসবোধ আর পড়ানোর দক্ষতা ছিলো স্যারের। সেকেণ্ড ইয়ারে এসেছিলেন এ সি দাশ। যতই বদরাগী হোন; ইনিও পড়াতেন ভালোই। ইনার ক্লাশে ছেলেরা বাগড়া দিতো বেশ; তারল্যের দোষের জনশ্রুতি ছিল স্যারের নামে। উঠতি বয়সী ছাত্রদের কাছে তাই তিনি বেশ আগ্রহের বিষয় ছিলেন। একদিন আধঘণ্টা ব্যাপী অ্যালকোহল-অ্যালডিহাইড এর লম্বা লম্বা বিক্রিয়া বুঝিয়ে ক্লাশের মাঝখান থেকে এক চিহ্নিত পাপীকে হাত নেড়ে ক্লাশনোট নিয়ে আসতে বললেন। পাপী বেচারার সাদা খাতা দেখে যখন স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পোলার কানে হাত রেখে স্যার হুংকার করলেন, 'কী করসো এতক্ষণ? হুম! করছোটা কী এতক্ষণ? তখন পুরো ক্লাশ কোরাসে জবাব দিলো, 'মদ খাইসে। স্যার, ব্যাটা এতক্ষণ বইসা বইসা মদ খাইসে।'

পুরো কলেজ লাইফে সবচেয়ে আনন্দে কেটেছে বাংলার ক্লাশগুলো; আর সবচেয়ে বৈচিত্র্যহীন ইংরেজির ক্লাশ। বাংলার কোন নির্দিষ্ট স্যার ছিলো না গ্রুপ থ্রি'র; সোহেল আহমেদ, মোখতার স্যার, মার্লিন ক্লারা পিনেরো, বকুলাপু, মানিক গোমেজ স্যার সবাই ক্লাশ নিয়েছেন আমাদের। ইংরেজিতে ক্লাশ করেছি আবিদুর রহমান স্যার আর শামসুজ্জামান স্যারের। মাঝে কিছুদিনের জন্য জাহাঙ্গীর কবির স্যার এসেছিলেন (ছাত্র মহলে জে.কে নামে পরিচিত; ইনার বিশেষত্ব হলো স্যারকে সব ক্লাশেই ছেলেরা জে.কে জে.কে বলে গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিয়ে স্বাগত জানায় এবং তিনি জননেতার ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে সবার শুভেচ্ছার জবাব দেন)। বাংলার স্যারদের প্রত্যেকের একেক ধরণের মুদ্রাদোষ ছিলো; সোহেল স্যারের 'আমি সুহেল আহমেদ, বাংলা পুড়াই; পুড়িয়ে খাই;' মোখতার স্যারের কপিলা আর বিলাসী নিয়ে আদিরসাত্মক বর্ণনা বা,'আমি তোদের সর্বনাশ করে ছেড়ে দেবো;' পিনেরু ম্যাডামের সুরে সুরে পড়ানো আর মানিক গোমেজ স্যারের বঙ্গবন্ধু-এরশাদ-শেখ হাসিনা-বিল ক্লিনটন সবার সাথে আন্তরিক সম্পর্কের বর্ণনা; আরো নানান ধরণের লাগামহীন গালগপ্পো; সবকটাই বেশ উপভোগ্য ছিলো সে বয়সে। যদিও মোখতার স্যার আর মানিক স্যার মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে বিরক্তিকর হয়ে উঠতেন; কঠিন কঠিন সব ক্লাশের ভিড়ে এই হালকা-আপাত অর্থহীন চাপাবাজি খুব একটা খারাপ লাগতো না।

কলেজে সবচেয়ে আজাব ছিলো ল্যাবগুলোতে। ফিজিক্স ল্যাবের প্রথম দিনেই ৯০ ভাগই মেকাপ মানে রিপিট খেলো। এই মেকাপের যন্ত্রণায় সারাক্ষণ তটস্থ হয়ে থাকতে হতো। ল্যাবসংক্রান্ত কাজের ব্যাপারে আমার বরাবরই অনীহা ছিলো। পুরো এক্সপেরিমেন্টের সময় আমি এদিক সেদিক ঘুরতাম; এর তার সাথে আড্ডা দিতাম। সময় শেষ হয়ে আসছে কিন্তু ডাটা মিলছে না, এ সময় আমার ডাক পড়তো। ব্যাক ক্যালকুলেশন করে রেজাল্ট মিলাতে ভালই ওস্তাদ ছিলাম, সুতরাং আমার গ্রুপ কখনোই মেকাপ খায় নি। দুইনম্বরী হলেও ফিজিক্স ল্যাবের এই জিনিসটা মনে হলে আনন্দ পাই; ফিজিক্স ল্যাবের সবচেয়ে আনন্দময় অংশ ছিলো ডার্করুম। আলো অথবা দর্পণ নিয়ে এক্সপেরিমেন্টে কত ধরণের পরীক্ষা আর বিজাতীয় কার্যকলাপ যে চলত! রসায়নে Salt Test করে খুব মজা পেয়েছিলাম। জীববিজ্ঞানে দুঃস্বপ্ন ছিলো ড্রয়িং; ব্যাঙের ছবির কথা মনে হলে এখনো আক্ষরিক অর্থেই গায়ে জ্বর চলে আসে। ড্রয়িং এ গবেট হবার কারণে বন্ধু সানির সাথে আমার একটা বোঝাপড়া ছিলো; কলেজ জীবনে ওর প্রায় সমস্ত গ্রাফ আমি এঁকে দিয়েছি; বদলা ব্যাঙ-তেলাপোকা-কেঁচো টাইপের সকল আঁকাবুকি আমারটা ও করে দিতো।

০৩

বাবা মা থেকে অনেক দূরে কাটানো কলেজ জীবনের পুরোটাই ছিল সংগ্রামময়। ১০৫ আরামবাগের দোতলায় থাকতাম আমরা তিন বন্ধু আর টিটু ভাই। সকাল সন্ধ্যা একই রুটিন, মেস-কলেজ-বাড়ি। সকাল বেলা দু'টাকার গোটা দুয়েক পরোটা, এক ডিম ওমলেট-মামলেট-পাটোয়ারী। এক ডিম ভাজার যে হরেক নাম হতে পারে সেও প্রথম শেখা কলেজ লাইফেই। আমাদের ক্লাশ হতো চারতলায়, কলেজ লাইব্রেরির পাশে; রুম নম্বর ৪৩৪। কলেজের বিশ মিনিটের টিফিনে

চারতলা থেকে দৌড়ে নেমে কাড়াকাড়ি করে ডিম প্যাটিস আর মাউন্টেন ডিউ। সে সময়টায় ডিউ নতুন এসেছে ঢাকায়; ব্যবসা প্রমোট করতে পাঁচটাকায় পাওয়া যেত ছোট্ট বোতল। সস্তা পেয়ে পারলে পাব্লিক হাতও ধোয় ডিউ দিয়ে; এক বোতল ডিউ আর ত্রিভুজাকার প্যাটিস খেতে খেতে আবার লাফিয়ে চারতলায় উঠা। একই নিয়ম দুবছর। ব্যতিক্রম হলে আরো বেশি ঝামেলা। গার্ডিয়ান আনো, জেল ক্লাশ করো; রিমেক দাও। সব ভেবে সেই কঠোর নিয়মই মাথা পেতে নিয়েছিলাম। স্টুডেন্ট গাইডেন্সদের উটকো সব উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য ৮৫% ন্যূনতম উপস্থিতির দরকার ছিলো; সেটা অর্জন করলেই কেল্লা ফতে। এর বেশি খাটতে কখনো যাই নি। পারফেক্ট অ্যাটেন্ডেন্স (১০০%) বলে একটা ব্যাপার ছিলো; সেই সম্মান কপালে জোটাবার চেষ্টা করি নি কখনো।

ক্লাশ হতো দুশিফটে; সকালে ফার্স্ট ইয়ার; দুপুর থেকে সেকেণ্ড ইয়ার। দুশিফটের মাঝখানে বিরতি ছিলো বোধহয় মিনিট দশেকের। জুনিয়ররা যখন ক্লাশ শেষে সিঁড়ি বেয়ে নামতো; সিনিয়ররা উঠতো ক্লাশ করতে। নটর ডেমের ক্লাশের স্মৃতি মনে হলেই কেন জানি আমার সিঁড়ির ধাপের সেই ঠেলাঠেলির কথা সবার আগে মনে পড়ে। ক্লাশ শেষে ক্যান্টিনে টেবিল টেনিস খেলা হতো সারা কলেজে দুটা মাত্র টেবিল, সেখানেও জায়গা পেতে অনেক কসরত করতে হতো। সেখানেও দুটো দল থাকতো; ঢাকার ছেলে আর ঢাকার বাইরের ছেলে। মূলত ঢাকার ছেলেদেরই প্রাধান্য ছিলো বরাবর। এই বিভাজনটা কলেজ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখেছি, কেন জানি বেশিরভাগ ঢাকার ছেলেরাই বাইরের ছেলেদেরকে বোকা আর অস্পৃশ্য মনে করে; কোনো পক্ষ হতে অন্য পক্ষ থেকে সুনিশ্চিত লাভের প্রত্যাশা ছাড়াই এই দুগ্রুপের মধ্যে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব চোখে পড়েছে খুবই কম। তাই আমার মনে হয় খ্যাতির টানে ঢাকার বড় কলেজে এসে ভর্তি হলেও সিংহভাগ গ্রামের ছেলেদের কলেজের দুবছর খুব নিঃসঙ্গ কাটে।

কলেজ লাইফের বৃহস্পতিবারগুলো ছিলো অন্যরকম। সপ্তাহের এই দিনটাতে কলেজে যেতাম একটা ছোট্ট ট্র্যাভেল ব্যাগ নিয়ে। আগের দিন রাতেই সেই ব্যাগ গুছিয়ে মাথার কাছে রেখে দিতাম; ক্লাশ করার সময় পায়ের কাছে। ক্লাশ শেষ হলেই ছুট্। কলেজের গেটটা পেরিয়ে ১১ নম্বর বা ৬ নম্বরে ঝুলে পড়তাম। বাড়ি যাবার জন্য মতিঝিল থেকে মহাখালি টার্মিনালের পথে অসহ্য ট্রাফিক জ্যামগুলোও যে কত মধুর লাগতো! বাড়ি যাবার আনন্দের সাথে এই পৃথিবীর আর কোন আনন্দের তুলনা হয় না।

দিন যত যাচ্ছে বাড়ি থেকে যেন ততটাই দূরে সরে যাচ্ছি। লম্বা বাস জার্নি পেরিয়ে সপ্তাহান্তের গোধূলিতে অনেকটা পথ হেঁটে আম্মু-আব্বুর কাছে ফিরে যাওয়ার স্মৃতিটুকু মাঝে মাঝে ফিরে আসে; ফিরে আসে ছোট্ট ছুটি কাটিয়ে বাড়ি ছেড়ে আবার শহরে রওয়ানা হবার স্মৃতিটুকু। আনন্দ দেয়, মাঝে মাঝে কষ্টও দেয়। তবু আমি অহর্নিশ এই স্মৃতিতে বাস করি, এই কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকি। এই পৃথিবীতে অনেকটা সময় খরচ করে বুঝেছি আমাদের সকল স্মৃতি-ই আস্তে আস্তে হৃদয় খোঁড়া বেদনা হয়ে যায়। আর আমার চলার পথে সেই বেদনাটুকুই একমাত্র পাথেয়।

সচল নামঃ রাফি
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/nabiul

কুবের আর কপিলা। বাংলা পাঠকজগতে দুই অতিপরিচিত নাম, রসিক শিক্ষক বা বাজারপ্রচলিত গাইডবইগুলোর অনেক পছন্দেরও বটে। তবু না চিনতে পারলে ধাম শুনলে আর চেনায় আর কোন সন্দেহই থাকে না- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি'। মোটামুটি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই উচ্চমাধ্যমিকে সহপাঠের পিঠে চেপে সবাই পদ্মাপাড়েই ঘুরছে, কুবের-কপিলার জীবন বিশ্লেষণ করে যাচ্ছে।

আমার সেসময় পদ্মাপাড়ে ঘুরতে হয় নি। নিত্যদিনের আনন্দবাজারে মাছের স্তূপ নিয়ে আসা চিরচেনা সুবল-অনন্ত কিংবা জেলেপাড়ায় ওদের অপেক্ষায় থাকা বাসন্তীদের জীবনের দিকেই উঁকি দিয়েছি আমরা, ছোট্ট শান্ত একটা নদীকে জানার চেষ্টা করেছি অদ্বৈত মল্লবর্মনের হাত ধরে, সহপাঠ ছিলো 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

তিতাসপারের ছোট্ট শহরে বেড়ে ওঠেছি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজে যে 'তিতাস একটি নদীর নাম' পড়ানো হবে এ আর কী এমন আশ্চর্য! একটু দূরে সদর হাসপাতালের সামনে দাঁড়ানো 'মহিলা কলেজে' যে পদ্মা নিয়ে নাড়াচাড়া করা হতো সেটাই বরং অবাক করার মতো!

তিতাস গ্যাসের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মিষ্টির শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সময়ের হাত ধরে আরো একটু পিছিয়ে গেলে সংস্কৃতির শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আরো পিছিয়ে গেলে বিপ্লবীর শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া- তবুও আপাত ছোট্ট এ শহরটায় সরকারী কলেজ বলতে সবাই ঐ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ আর তার বোন ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী মহিলা কলেজকেই চেনে।

শত বছর পুরোনো অন্নদা স্কুল থেকে সদ্য পাশ করেছি, বাসার বাইরে যাব এমন চিন্তা মাথার ত্রিসীমানার মধ্যেও নেই, মা-খালাদের মতো মহিলা কলেজে তো যাওয়া যায়না- চাই কি বাসার একদম কাছেই হোক, কাজেই নানা-মামা-খালু-খালাতো ভাইয়ের দেখানো পথ ধরে চিনে নিয়েছি রেলগেট পেরিয়ে মৌড়াইলের কাছে কলেজপাড়ার সরকারী কলেজকেই। মহানগর প্রভাতি, উপকূল এক্সপ্রেস, মহানগর গোধূলি বা সিলেট যাওয়ার পারাবত এক্সপ্রেসে যাওয়া আসার সময় চোখ অবধারিতভাবেই এখনো তিনতলা হলুদ বিল্ডিংটাকে খুঁজে নেয়, আর মন সুবর্ণ এক্সপ্রেসের গতিতে পেছনের দিনে ছোটে।

পাইকপাড়ার বাসা থেকে রিকশায় গেলে দশ মিনিটের পথ, পয়দল হলে মিনিট বিশেক, আর দল ভারী থাকলে ৩০ মিনিট ছাড়িয়ে ঘন্টা ছুঁই ছুঁই করতো সময়ের কাঁটা। অবশ্য খুব কমই একবারে যাওয়া পড়েছে কলেজে- কখনো হয়তো প্রিয় সাইকেল চেপে কুমার শীলের মোড় হয়ে নিউ সিনেমা হল রোড ধরে অতি পছন্দের মিষ্টির দোকানগুলো পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছি, কে দাশের মোড় থেকে সুপারমার্কেটের দিকে এগিয়ে গেছি পশ্চিমে, কাঁচারীপুকুরের সামনে মেইন রোডে ওঠে প্যাডেল চালিয়েছি দক্ষিণে, কলেজের দিকে।

কখনো একদম সোজাপথ ধরেই গেছি- কুমার শীলের মোড় হয়ে সদর হাসপাতালকে হাতের বাঁয়ে আর মোড় ঘুরতেই হাতের ডানে থমকে থাকা মহিলা কলেজকে পেরিয়ে ছুটেছি নাক বরাবর, সেই কাঁচারীপুকুর, পোস্টাফিস পার হয়ে পুলের গুঁড়ির দিকে।

অন্য বিকল্প পথটার কথাও বলেই ফেলি- কুমার শীল মোড়ের খানিকটা আগে, পশ্চিমে গলিটা ধরলে হাতেয় ডানে পড়ে আরেক পুরোনো স্কুল রাম কানাই স্কুল। এ রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে ট্যাংকের পাড়, কালীবাড়ির সামনের গলি ধরলে একদম সোজা অন্নদা স্কুল- ছ'বছর ওখানেই কেটেছে আমার।

কলেজে যাওয়ার সময়, তাই এই দফা আবার গলি ধরে জেলপুকুরের সামনের রাস্তায় বের হয়ে ফুলবাড়িয়ায় বন্ধুর বাসার পথ ধরলাম না। এরচে বরং বামপন্থী হই, ছোট্ট পুরোনো ভাঙা মন্দির, মহিলা কলেজের হোস্টেল, কাদের ডাক্তারের চেম্বার হয়ে চলে আসি মৌলভীপাড়ার রাস্তায়, মডেল গার্লস স্কুল আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল পেরিয়ে পৌর মার্কেটের পাশের রাস্তা দিয়ে আবার উঠি মেইন রোডে- কাঁচারীপুকুরের হাওয়া খেয়ে পোস্টাফিসের সামনের রাস্তা দিয়ে বেরুনো না হয় স্থগিতই রইলো এ দফা।

পুলের গুঁড়ি না হয়ে শহরের এপাশ থেকে ওপাশে যাওয়া যায়না, কাজেই সব রাস্তা এখানে এসে মিলবেই। পুলের উপর থেকে মোটামুটি বাতাসে ভেসে নিচে নামতে থাকা আর উপরে উঠতে থাকা রিকশাগুলোকে পাশ কাটিয়ে একটানে নিচে নেমে নাক বরাবর চলতে থাকলে একে একে পেছনে পড়ে যেত জামেয়া ইউনুসিয়া,

আশিক প্লাজা, ফারুকী মার্কেট, কালী বাড়ির মোড়।

এরপরই জেলা পরিষদ আর রেলস্টেশন যথাক্রমে হাতের বাঁয়ে আর ডানে। স্টেশন রোডে ঢুঁ দিয়ে আসার লোভটা সামলে নিতে পারলেই সামনে পরিচিত টেম্পুস্ট্যান্ড- ভাদুঘর, কাউতলী বা আরো দূর থেকে আসা টেম্পুগুলো এখানেই যাত্রী নামিয়ে যায়।

দুনিয়া দেখতে দেখতে সামনে তাকালেই চোখে পড়ে রাস্তার ওপারে ছোট্ট জলামতো জায়গাটার পরেই সোজা লম্বামতো একতলা বিল্ডিং। কলেজ? না না, এটা নিয়াজ মোহাম্মদ স্কুল- অনেক পুরোনো, সেই ব্রিটিশ আমলে গড়া, তখন নাম ছিলো জর্জ হাই স্কুল।

স্কুলের সামনে বিশাল সবুজ মাঠ, শীতের সকাল যদি হয় তবে প্রগাঢ় ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনা ওপাশে। তবে ঝলমলে দিন যদি হয়, কিংবা তুমুল বৃষ্টিঝরা দিন, মাঠের ওপারে দৃষ্টি পৌঁছাবে- দক্ষিণ প্রান্তে তিনতলা আই-শেপড বিল্ডিংটা নজর কাড়বেই, মাঝামাঝি ওপরে ওর পরিচয়ও জানান দিচ্ছে যে- "ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজ, স্থাপিত-১৯৪৮"।

ইচ্ছে করলে নিয়াজ মোহাম্মদ স্কুলের ছোটো গেট দিয়ে ঢুকে মাঠ পেরিয়ে চলে যাওয়া যায় কলেজের দিকে, সে পথ ধরা বাদ থাক। বর্ষাকাল যদি হয় তাহলে সবুজ ঘাসের আড়ালে ঐ মাঠে লুকিয়ে আছে প্যাচপ্যাচে কাদা, কাপড়েল ঝুল ময়লামুক্ত রেখে কলেজ পৌঁছা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর যদি হয় গরমের মৌসুম, রাস্তার পাশের গাছের ছায়ায় হাঁটার আরাম ছেড়ে খামাখা কাঠফাটা রোদে পেরেশান হওয়ার মানেই তো নেই কোনো।

এরচেয়ে ভালো রেলগেট পেরিয়ে নাক বরাবর চলতে থাকা, নিয়াজ মোহাম্মদ স্কুল হাতের বাঁয়ে থেকে পেছনে পড়ে যাবে, আরেকটু এগুলে ডানে পড়বে জেলা ফুড অফিস আর লাগোয়া ছোট কিন্তু পুরনো এক মসজিদ। যেহেতু সবে কলেজে যাচ্ছি, সময়টা নিশ্চয় সকাল, মসজিদে আসার সময় এখনো হয়নি। তাই এগিয়েই যাই বরং, ছোট্ট ডোবা আর ঝালাইয়ের কাজ করার ইঞ্জিনিয়ারিং দোকানটাও হাতের ডানে থেকেই পেছনে পড়ে যাক।

এখন কিন্তু কলেজগেটের কাছে পৌঁছে গেছি, সীমানাপ্রাচীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা শহীদমিনারের পেছন দিয়ে চলে এসেছি একদম কলেজের মূল গেটের মুখে। দেয়ালে বসে থাকাদের কেউ পরিচিত থাকলে একটু কুশল বিনিময় করে নিলাম নাহয়, দেখে নিলাম দেয়ালে ঝোলানো খাঁচাঘেরা নোটিশ বোর্ডটাও। যেহেতু কোন ছুটির নোটিশ নেই তার মানে কলেজ খোলা, অতএব বিশাল লোহার গেটটা ঠেলে ঢোকা যেতে পারে, দোষ নেই তাতে।

গেটে তালা লাগানো? শেকল? থাক। কাউকে ডাকাডাকি করার কিছু নেই, বড় গেটেই ছোট্ট কেঁচি গেট আছে, মাথাটা একটু নুইয়ে ঢুকে পড়লেই হলো। কেউ আটকাবেনা নেহায়েত যদি কেউ জিজ্ঞেস করেই বসে তখন পকেটে আই ডি কার্ড আছে, চটপট দেখিয়ে দেব; ব্যস, খেল খতম! মনে কি মেয়াদ নিয়ে কোন প্রশ্ন উঠে আসছে নাকি? একদমই অনাবশ্যক চিন্তা- আই ডি আছে এই তো বেশি, মেয়াদ আবার কী চিজ?!

গেট পেরোলেই নিশ্চিতভাবেই কলকাকলী কানে আসবে। অবাক হয়ে পাখি ডাকছে ভেবে শহীদ মিনারের পাশের বিশাল গাছটার ডালে চোখ ফেলার কিছু নেই, শব্দ আসছে সামনে জটলা পাকানো ক'জনার গলা থেকে।

বলিনি বোধ হয়- আমাদের কলেজে ছেলেরা যেমন পড়ে তেমন পড়ে মেয়েরাও। এক সরকারী কলেজে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা পড়তে পারলে শহরের আরেক সরকারী কলেজে মেয়েদের পাশাপাশি কেনো ছেলেরা পড়তে পারবেনা এ প্রশ্ন যদি এসেই পড়ে মনে, আগেই বলে রাখি উত্তর জানিনে আমি।

যাহোক, ছেলেদের স্কুল থেকে আসা ছেলেরা আর মেয়েদের স্কুল থেকে আসা মেয়েরা এক হয়ে ছোট ছোট বন্ধুজট করে নিতে সময় নেয়না তেমন, স্কুলে প্রাইভেট টিউশনে পূর্বপরিচয় বেশ কাজে লাগে হঠাত, কলরবের শব্দ তাই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

ড্রেসের নামে নিয়মের বাড়াবাড়ি এখানে গরহাজির, তাই সাদার ঝলক যেমন চোখে লাগে তেমন লাল-নীল-সবুজ-হলুদ-কমলা-বেগুনি-আসমানিও হাজির থাকে আড়ম্বরে, এমনকি কালোও দেখা যায় কোথাও কোথাও।

তিনতলা বিল্ডিংয়ের একদম শুরুতেই নীচতলার প্রথম রুমটা ছাত্র সংসদের জন্য বরাদ্দ। ভেজানো জানালাটা দিয়ে উঁকি দিলে হয়তো চোখে পড়বে আধখাওয়া সিগারেট হাতে কারোর মুখ, হাইবেঞ্চিতে বসে সুখটান দেয়ায় ব্যস্ত। ওদিকে নজর দেয়া সমীচীন হবেনা, এরচে বরং বাকি কলেজটা নিয়ে ভাবাই শ্রেয়তর।

একপ্রান্তে এই ছাত্রসংসদ, আর এই ভবনের যেখানে শেষ ওখান থেকে একটা সিঁড়ি ওঠেছে পূর্ব দিকের পুরোন ভবনটায় ওঠার জন্য। খোপ খোপ গ্রিলে ঘেরা বারান্দা, এর পাশেই লম্বা ঘর- ছেলেদের কমন রুম। বড় বড় দুটো টেবিল একসাথে রাখা, চারপাশে আদি যুগের নকশাওয়ালা লম্বা চেয়ার। টেবিলে পেপার, ম্যাগাজিন রাখা- পড়া যেতে পারে, তবে একটু সাবধান থাকা দরকার, কনুই বা কব্জির কাছে লাল হয়ে ফুলে যেতে পারে, এ আর এমন কী? একপাশে বড় ক্যারাম বোর্ড, ঘুটি-স্ট্রাইকার-পাউডার রাখাই আছে সাজানো, খেলার ইচ্ছে থাকলেই হলো।

তাও ভালো না লাগলে জানালার পাশে দাঁড়ানো যেতে পারে। সবুজ রং করা জানালার দুটো পাট খুলে দিলে কাঠের ফ্রেমে কোনমতে আটকে থাকা রডগুলোর ফাঁক দিয়েই উড়ে আসবে দখিনা হাওয়া। পুকুরের উপরে পিলারে দাঁড়ানো মসজিদটা চোখে পড়বে, একটু কসরত করলে দক্ষিণ-পূর্ব কোনের অর্থনীতি ভবন দেখা যাবে। দৃষ্টিতে অস্পষ্ট করে হলেও ধরা পড়বে ব্যবস্থাপনা ভবন, মসজিদের পাশের মাঠ আর মাঠের ওপাশে ছেলেদের হোস্টেল।

যে সিঁড়ি দিয়ে এখানে উঠে এসেছি তার ঠিক নীচে একটা ছোট গেট, কিন্তু এখন ইট গেঁথে বন্ধ করা। ছেলেদের হোস্টেল বা ওদিককার বিভাগীয় ভবনগুলো থেকে কলেজে আসা যাওয়ার জন্যই ঐ গেট। কিন্তু ইতিহাস বলে ছাত্র সংসদে যে মান্যবরেরা বসেন তারা নিজেরা তো ঐ গেট দিয়ে আসতেনই, 'প্রয়োজনে' নিয়ে আসতেন 'শায়েস্তা করার' নানান রকমারি উপকরণ! এই ছোট্ট গেট বন্ধ হওয়ায় অনেকটা হঠাত করেই কমে যায় শহর তোলপাড় জাগানো সব শায়েস্তা অভিযান।

একদমই 'নিউ ফার্স্ট ইয়ার' তখন- একটা ঘটনা বলি।

ক্লাস সবে শুরু হয়েছে। লেকচার থিয়েটারে ক্লাস। ফাঁকে বলে নেই, লেকচার থিয়েটারটা ঠিক মূল ভবনের লাগোয়া। যেখানে মূল ভবনের শেষ ওখানেই এর শুরু, তবে I-শেপড থেকে L-শেপড হয়েছে কলেজটা এ লেকচার থিয়েটার থেকেই। লেকচার থিয়েটারটা এক তলা- মাঝখানে পার্টিশন বসিয়ে দুটো ক্লাসরুম করা হয়েছে। লেকচার থিয়েটারের করিডোর পেরিয়ে নতুন বিজ্ঞান ভবন, শহীদ লুতফর রহমানের নামে, সেই 'উন্নত জীবন', 'মহত জীবন' লেখা লুতফর রহমান। এটাও বলে রাখা দরকার বিজ্ঞান ভবনের কলাপসিবল গেট পর্যন্তই আমার দৌড়, বানিজ্যের ছাত্র বিজ্ঞানের সারথী হবে কেমন করে?!

যা বলছিলাম, ক্লাস তখন সবে শুরু হয়েছে- কয়েকদিন গেছে মাত্র। স্যার কিছু বলছেন, আমরা কেউ শুনছি, কেউ খুনসুটি করছি, কেউ অপলক তাকিয়ে আছি ডানপাশে- (সহপাঠিনীরা ওদিকেই বসে!), কেউ তাকিয়ে আছি মাঠের দিকে, কেউ ক্লাস পালানোর পাঁয়তারা করছি।

হঠাত বাইরে থেকে সমস্বরে হৈ হৈ শব্দ, দুম দুম বিকট শব্দ হলো বারদুয়েক, একজনের উঁচু করা হাতে রোদ পরে ঝলমল করে উঠলো একবার। অভিজ্ঞরা বুঝে নিলো যা বোঝার, অল্প সময়েই স্যার হাওয়া, ক্লাসে থাকা অন্যরাও। আমরা বেরোতে বেরোতে ওরা চলে এসেছে, খুঁজছে কাউকে, আমাদেরই একজন। অপরাধও জানা গেলো- ওদের একজন আমাদের সাথে পড়া এক মেয়েকে পছন্দ করে বসেছে (মেয়েটি অবশ্য তা জানেনা তখনো)। আমাদের ঐ ছেলেকে দেখা গেছে মেয়ের সাথে কথা বলতে, অতএব শায়েস্তা অভিযান!

যে ছেলেটি ঘটনাক্রমে নায়ক হয়ে গেছে সে বিপদসংকেত পেয়েই হোক বা বিপদ আঁচ করতে পেরেই হোক, ততক্ষণে লাপাত্তা। সুতরাং নিয়মানুযায়ী একটু চেঁচামেচি করার পর ভিলেনদল ক্লাস থেকে বেরিয়ে মাঠে টহল দেয়ার দায়িত্ব নিলো, আগের মতো দুম দুম শব্দ হলো বারদুয়েক।

ক্লাস থেকে সবাই বেরিয়ে গেছে, কিন্তু মাঠ পেরিয়ে কলেজ ছাড়ার উপায় নেই, আবার নীচ তলায় থাকাটাও নিরাপদ না। আমরা সবাই মূল ভবনের করিডোর হয়ে মাঝামাঝি পৌঁছে দোতালার সিঁড়ি ধরলাম, দোতালায় এক মেরুতে অধ্যক্ষের কক্ষ আর আরেক মেরুতে শিক্ষক মিলনায়তন রেখে আমরা ভিড় করলাম লাইব্রেরির সামনে, 'নাটক' সবচেয়ে ভালো দেখা যাচ্ছে ওখান থেকেই।

ভিলেনদল তখনো মাঠে, মাঝে মাঝেই কারণ ছাড়াই এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। হঠাত প্যাঁ প্যাঁ শোনা গেল, আমরা দোতলা থেকে দেখলাম রেলগেট পার হয়ে নীলরঙা পুলিশ পিকআপ ছুটে আসছে কলেজের দিকে, কলেজ থেকেই ওদের খবর দেয়া হয়েছে বোধ হয়। ভিলেনদল আবার সক্রিয় হলো, এবার দুম দুম প্রথমে,

এরপর বুম বুম বুম। জর্দার কৌটা দিয়ে বানানো ককটেল। ধোঁয়া আর শব্দ পশুর মতো হিংস্র চিতকার। পুলিশ গেট পেরোতেই অবশ্য বীরত্বে কমতি দেখা গেলো, গেরিলা পদ্ধতিতে খানকয়েক ককটেল ছুটে গেলো পুলিশের দিকে। এর মধ্যেও অবশ্য পলায়নপর্ব শুরু হয়ে গেছে, শেষও হলো যথাসময়ে, এক গাড়ি পুলিশ- ওরা পালানো ঠেকাবে কী করে! কিছুক্ষণের মধ্যে মাঠ ফাঁকা, পোড়া গন্ধ আছে, পুলিশ ছাড়া মানুষ নেই। পুলিশ নিশ্চিন্ত, খুশিও। কজন কলেজেই হাঁটাহাঁটি করছে, দুজন বসা গেটের পাশে দাঁড় করানো নেভি ব্লু পিক আপে।

উপর থেকে আমরা তখন অন্য নাটক দেখছি, পালিয়েছে যারা তাদের দুয়েকজন আবার ফিরে ঘুরঘুর করছে পুলিশ পিক আপটার কাছাকাছি। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাত বুমম শব্দ, বেশ জোরে, গাড়ি দেখা যাচ্ছেনা আর ধোঁয়ার চোটে, কীর্তিমানেরা এর মধ্যেই উধাও!

ধোঁয়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেলো দুই পুলিশপ্রবরকে, ওরা ছিলো গাড়িতেই। ঊর্ধ্বশ্বাসে গেট পেরোলো দুজন, চরম আতংকিত। সহকর্মীদের দিকে ফিরেও তাকালোনা তারা, একদৌড়ে ওঠে এলো দোতলায়, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য! রক্ষকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আমরা খুশি, কজনকে দেখা গেলো দাঁত বের করে হাসছে!

কী আশ্চর্য! পুলিশ বলে কি ওদের ভয় ডর থাকতে পারেনা!? এ নিয়ে অত হাসির কী আছে?!

দুরন্ত ঘটনার সাক্ষী এই লাইব্রেরির পাশেই রিডিং রুম। এ দুটো রুম সবসময়ই খালি পাওয়া যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা ভুলেও এমুখো হয় না। পাশের রুমটায় অবশ্য ছাত্রীরা যায় নিয়মিতই, বেশ ভীড়ও থাকে ওখানে। 'ছাত্ররাও' চেষ্টা করে অবশ্য যাওয়ার, পারেনা। আশেপাশে থাকতে পারলেও ওরা খুশী কিন্তু ওই রুম থেকে বেরিয়ে আসা আয়া তা হতে দিলে তো! 'মেয়েদের কমনরুম' পাহারার দায় তো তারই সবচেয়ে বেশী।

কলেজে ঢোকার মুখে যে জটলাগুলো চোখে পড়েছিলো সেগুলো কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হয় দোতলার এ ঘর বরাবর নীচের সুরকিময় লালচে চলার পথটায়, কারণটা নির্দিষ্ট করে বলা অবশ্য মুশকিলের কাজ।

এখানে একটা মজার ঘটনা দেখেছিলাম, বলেই ফেলি।

আমাদের এক বন্ধুকে আমরা আদর করে 'মৌচাক' ডাকতাম। 'মৌমাছি'রা ওকে এমন করে ঘিরে রাখতো যে আমরা কাছেই ঘেঁষতে পারতাম না। একদিন মৌচাক দাঁড়িয়ে আছে, মৌমাছিদের নিয়ে- একদম জায়গামতো। আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়ে, মহারাজ আমাদের সাথে যোগ দিলে ক্লাসের দিকে যাওয়ার খায়েশ। কিন্তু রাজাধিরাজের মিটিংয়ের আর শেষ হয়না হঠাত তাঁর নজর পড়লো দোতলার বারান্দায়, কমন রুম থেকে বেরিয়ে এক বান্ধবী আর একজনের সাথে আলাপে মেতেছে তখন। তাই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন চেষ্টা করলেন তিনি, 'দ' আদ্যক্ষরের বান্ধবীটিকে নাম ধরে ডেকে। প্রথম ডাকে মনোযোগ পাওয়া গেলো না, অতএব দ্বিতীয়বার, "এএইই, দী...!" ডাক শেষ হয়নি, চট করে কেনো জানি মুখ নামিয়ে নিলেন তিনি- দোতলার উপর দিয়ে তখন ফটফট ডানা ঝাপটে একটা কাক উড়ে যাচ্ছে, তার গলায়ও ডাক, "কা ক্বা কা!"

ঘটনা আন্দাজ করে তাড়াতাড়ি ছুটে যেতে হলো কাছে। মৌচাক তখন মৌমুক্ত, ওরা পাশে দাঁড়িয়ে কলকল করছে। বন্ধুটির অবস্থা তেমন সুবিধার না অবশ্য, বিচিত্রভাবে মুখব্যাদান করে বসে, ক্ষণে ক্ষণে জিহ্বা বের করছে কেন জানি!

অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বন্ধুটি পরে বহুবার বলার চেষ্টা করেছে ও সেদিন মোটেও কাকের ইয়ে গেলেনি, আমরা ততবারই মনে করিয়ে দিয়েছি উপর থেকে টুপ করে পড়ে চলাত করে গলা পেরিয়ে যাওয়ার ক্লাসিক স্মৃতির কথা!

সুরকি বিছানো মাটির রাস্তাটা শুধু চলার পথই নয়, চড়ারও। গেট খুলে দিলে রিকশা, কলেজের বাস আর গেট বন্ধ থাকলে সাইকেল, বাইক ঢুকতে পারে এ রাস্তা মাড়াবে বলে। মূল ভবনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লেকচার থিয়েটার অবধি পৌঁছতে পারলেই ওদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা আছে- বারান্দার সামনেই সিমেন্টে গাঁথা সারি সারি গোল করা লোহার রড, সাইকেল স্ট্যান্ড। এ স্ট্যান্ডে আমার চকলেট রঙের হারকিউলিস সাইকেলটাও বিশ্রাম নিয়েছে ওখানে, দিনের পর দিন।

রাস্তাটার অবশ্য মনে থাকার কথা, সাইকেলে ডাবলিং করাও শিখেছিলাম ওরই বুকে। "ব্রেক নাই ডাবলিং পারিনা ব্রেক নাই ডাবলিং পারিনা" করতে করতে চেঁচিয়ে সামনের ভীড় সরিয়ে পতন ঠেকাতে ঠেকাতেই একদিন আবিষ্কার করলাম আরেকজনকে পেছনের ক্যারিয়ারে চাপিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছি! পেছনে যে

থাকতো, ডাবলিং সাইকেলবিদ্যায় আমার কোচ, তারও সাইকেল ছিলো নিজের কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই ওটা ওর বাসার পেছনের রুমে ঠাঁই নেয়, আরো কদিন পর হাতবদল হয়ে একদমই চোখের আড়ালে। আমার হারকিউলিসটি অবশ্য আমার অধিকারেই ছিলো, বাসার বারান্দার গ্রিল কেটে চোরবাবাজি নিজের অধিকার বুঝে নেয়ার আগে পর্যন্ত।

এল টির এ বারান্দার দুয়েকটা ঘটনাও মনে করার মত।

ক্লাস একটা শেষ হয়েছে- এর মানে হচ্ছে 'বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে যাওয়া যাক', এটা কে না জানে? এমনি এক ক্লাসের পর দাঁড়িয়ে আছি, বন্ধুর সাথে চরম আড্ডায় ব্যস্ত, কোন একটা তর্ক চলছে- দুজন মতামত নিয়ে দুই মেরুতে। হঠাত করে কাঁধে টোকা পড়লো, "ক্লাসে যাও!" "আমার যখন ইচ্ছা ঢুকবো" বলার জন্য যখন পেছন ফিরেছি তখন দেখি বারান্দায় আর কেউ নাই, পেছনে স্যার দাঁড়িয়ে!

আরেকটা ঘটনা বলি, এটাও মন্দ না।

আমাদের সাথে একজন ছিলো, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাইরে থেকে এসেছে। কোন না কোনভাবে ও খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে এখানে ভালো ছাত্র কারা, এরপর থেকেই ওদের সাথে ভাব করার চেষ্টা। মজা দেখার জন্যই কিনা কেউ ওকে আমাদের দিকে ঠেলে দিয়েছে। দুয়েকদিন বুঝিয়েছি ঠান্ডা মাথায়, এরপরও দেখি একই ঘটনা। চরম বিরক্ত আমরা।

এমনি একদিন দাঁড়িয়ে আছি, ও এসে হাজির। কী করি কী করি ভাবতেই চোখ পড়লো সামনে, মুশকোমতন এক বন্ধু সদ্য গেট পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছে। পাশে দাঁড়ানো বন্ধু তারেকের সাথে এক পলকে ভাবের আদান প্রদান হয়ে গেলো। ও ঘুরে তাকালো যন্ত্রণামানবের দিকে, "এই শোন শোন! এদিকে আয়!" "কি হইছে?"- ও তাকালো তারেকের দিকে। "জানস? তোরে তো আজকে পিটবো?"- ছেলের মুখে চট করে ভয়ের ছাপ পড়লো- "ক্যান ক্যান? কে পিটবো? আমি কী করলাম?" তারেক এবার আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলো মুশকোমানবকে- "ক্যান জানিনা, তবে ও তরে পিটবো। ঐ দ্যাখ তোরেই খুঁজতেছে মনে হয়!" এরপর যা হলো তাতে আমরাই অবাক, যন্ত্রণা-মানব গিয়ে মুশকো মানবের উপর, "বাই, আমি কী করছি? আমারে মাইরেন না!" মুশকো-মানব বড়ই ভদ্র মানুষ, কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। ও যতই বলে ও কিছুই জানেনা, কিছুই করবেনা ও, যন্ত্রণা ততই ওকে চেপে ধরে। শেষমেষ যন্ত্রণা আমাদের দেখাতে গেলো খবরদাতা হিসাবে, আমরা কি আর আছি নাকি তখন সেখানে?! তবে একটা উপকার পেয়েছিলাম, যন্ত্রণা আর ধারেকাছে আসেনি আমাদের।

এতো এতো কাহিনী যে ক্লাসে ঢোকার সময়ই পাইনি এতক্ষণ। ক্লাসের কাহিনিও হোক দুয়েকটা।

একদম প্রথম দিন। বসে আছি ক্লাসে। শুরু হয়নি তখনো। তিনসারিতে বেঞ্চি সাজানো, ডানের সারিতে মেয়েরা। পুরো ক্লাসভর্তি মানুষ আর মানুষ, পরে কখনোই আর এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়নি।

যাহোক, ছাত্রসংগঠনগুলো মিছিল করে জ্বালাময়ী শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছে। একদলকে দেখা গেলো ব্যতিক্রম, ওরা শুধু শুভেচ্ছা না, সাথে নিয়ে এলো বোঁটাসহ লাল গোলাপ। কিছুক্ষণ শুভেচ্ছা বিতরণের পর শুরু হলো গোলাপ বিতরণ, সুন্নতি তরিকায়, ডান থেকে। ওমা কী আশ্চর্য, মেয়েদের দেয়া শেষ হতে না হতেই গোলাপও শেষ! তাই বলে ছেলেদের কি বরণ করা হবেনা? তাই কি হয়!? পালা করে ওদের কাছেও পৌছে দেয়া হলো -গোলাপের কাঁটাওয়ালা বোঁটা!

ছেলেদের বঞ্চিত করার আরো একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

ইংরেজির এক স্যার ছিলেন আমাদের। খুবই অমায়িক, মিহি গলার স্বর। দুদিন ক্লাস না হতেই ঝামেলা নজরে পড়লো সবার, স্যার কেবল ক্লাসের ডানদিকে চড়ে বেড়াতেই পছন্দ করেন। ওদের সাথেই তাঁর কথাবার্তা, হাসাহাসি। ফিসফিস করে কী বলেন, ওরা হেসে কুটিকুটি হয়, আমরা বেকুব হয়ে বসে থাকি। একজন শেষ পর্যন্ত বলেই বসলো, "আপনার কথা কিছুই শুনিনা!" স্যার বললেন, "ইচ্ছে থাকলেই শোনা যায়!" আরো কী একটা বললেন, তাঁর ছাত্রীরা শুনে হেসে অস্থির, আমরা তখন বাতাসে শব্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি! স্যার এখন মহিলা কলেজে আছেন, ভালো আছেন নিশ্চয়ই।

কলেজের বাতাসটা বড়ই সুখের, অনেক ঘটনা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ইচ্ছে করলে বলা যায় প্রণব স্যারের বঙ্গভাষা পড়ানোর গল্প, রব্বানী স্যারের হিসাব কাহিনি অথবা শাহেদ স্যারের চাহিদা যোগানের তত্ত্ব। ধর স্যারের শর্টহ্যান্ডের গল্পও করা যায়। যদি ক্লাস থেকে বেরোই তাহলে করা যায় চিটাগাং কলেজ থেকে আগত বাংলা স্যারের অভিনব টিউশন দাওয়াতের গল্প। বলতে হয় আরো

দুয়েকজন স্যারের ছাত্রীপ্রীতির কথা কিংবা পিকনিকে গিয়ে ওদের পটানোর চেষ্টা। পিকনিকে কজনের রূপ বদলের গল্প। কলেজের গন্ডি থেকে বেরোলেই ঝটপট জুটে যাবে টিউশনকেন্দ্রীক হরেক স্বাদের কাহিনি। বন্ধুদের আড্ডার ঘটনাগুলো নাহয় ছেড়েই দিলাম।

মজার একটা গল্প দিয়েই শেষ করবো।

ততদিনে ফার্স্ট ইয়ার পেরিয়ে সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছি। ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছি নিয়মিত। একটা করি তো তিনটা করিনা এই অবস্থা। কলেজ যাওয়া কিন্তু বন্ধ নেই। যাই, আড্ডা দেই, চলে আসি বাসায়। এভাবেই চলছে।

হঠাত একদিন কী মনে করে তিন-চারজন মিলে দাঁড়িয়েছি মাত্র বারান্দায়, কোথেথকে এক স্যার এসে হাজির-"তোমরা সেকেন্ড ইয়ারের না?" উত্তর দিলাম আমরা, "জ্বি স্যার!" "আসো আসো ক্লাসে আসো। বাইরে কেন? ক্লাস খালি কেন? আর কেউ নাই? ওদেরও ডেকে নিয়ে আসো"- তিনি একবারেই অনেক কথা বলে থামেন। আমরা আর কী করি? মাঠে বারান্দায় আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে এমন কজনকে বুঝিয়ে ক্লাসে নিয়ে এলাম। পুরো ক্লাস খালি, বসতে হলো একদম সামনে, স্যার ক্লাস শুরু করলেন।

একটু সময় না পেরোতেই উশখুশ শুরু হলো পাশে বসা তারেকের, "ল যাইগা!" "থাকিনা! ক্ষতি কী?"- ক্লাস পালানোর অভ্যাস না থাকা আমি ফিসফিস করলাম। একটু পরে আবার কানের কাছে আওয়াজ, "ল যাইগা!" আরো বারদুয়েক চললো এমন। এরপর অনেকটা বিরক্ত হয়েই বলতে হলো, "ঠিক আছে, আয় যাই!" কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে? ক্লাস চলছে, একদম স্যারের নাক বরাবর বসা, তেমন বেশী ছাত্র ছাত্রীও নেই যে চোখ এড়িয়ে যাবে, বলতে গেলে উপায়ই নেই কোন।

হঠাত স্যার বোর্ডে গেলেন কিছু একটা লিখে বোঝাবেন, আমরা দেখলাম এই সুযোগ! ঝট করে বেঞ্চি থেকে খাতা হাতেই দুই সারির মাঝের পথ দিয়ে দৌড়। স্যার তখনো আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। আমি পেছনে দরজার কাছে চলে এসেছি তখন হঠাত পেছনে খট কড়ড়ড় জাতীয় বিকট আওয়াজ! ফিরে দেখি তারেক ক্লাসের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে, বসার একটা বেঞ্চে পা লাগিয়ে অতিকায় শব্দ করে ও সবার দৃষ্টি কেড়েছে। স্যার তখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে! হয়তো মনে করার চেষ্টা করছেন তাঁর ঐ ক্লাসে ছাত্র ছাত্রী জোগাড় করার কাজটা এ ক্লাস পালানো দুতিনজনই করেছিলো কিনা?!

চোখে রঙিন চশমা নাকি কলেজে এসেই লাগে। তা না হলেও চশমা লেগেছে চোখে কলেজে এসেই, "ভাব!"-জাতীয় বাঁকা মন্তব্যও কানে এসেছে তখন। সে গল্প তোলা থাকলো পরের কোন সময়ের জন্য। তোলা থাকলো কাছের আরেক বন্ধুকে হঠাত শেভ করিয়ে এনে সবার সামনে ফেলে দেয়ার গল্পও। লেখালেখি শুরুর গল্পও রয়ে গেলো পরে বলার জন্য।

সময় অনেক গড়িয়ে গেছে এর মধ্যে। কাজেই বাসায় ফেরাটা জরুরি। বারান্দার সাইকেলস্ট্যান্ড থেকে হারকিউলিসকে মুক্ত করেই ফেরার পথ ধরা যাবে। প্যাডেল চেপে পৌঁছে যাবো গেটের কাছে। পুরোনো অভ্যাসমতো একবার পেছন ফিরেই আবার চলতে শুরু করবো।

হয়তো রেলগেট পেরিয়ে সোজা চলে আসবো বাসার দিকে, হয়তো খেয়ালের বশে ছুটে যাবো নিয়াজ পার্কের দিকে। মিশন হাসপাতালটাকে বাঁয়ে রেখে চলতেই থাকবো, পৌঁছে যাবো সেই জেলা স্টেডিয়াম পর্যন্ত। কাউতুলী থেকে বাইপাসের ঘুরতি পথ হয়েই হয়তো প্যাডেল চালাতে থাকবো, অকারণেই। চেনাজানা পথের গন্ডি পেরিয়ে অচেনাকেই হয়তো চিনে নেবার চেষ্টা করতে থাকবো আবারো।

কিংবা হয়তো কালীবাড়ির মোড় থেকে গোকর্নঘাটের দিকে মোড় ঘুরবো, সূর্যাস্ত দেখতে ছুটবো পৈরতলা রেলগেটের পছন্দের জায়গাটায়। চাই কি চলে যাবো পিয়ারী পুল, দিগন্তজোড়া সবুজ দেখে মন সতেজ করে আসবো। অথবা হয়তো সাহস করে চলে যাবো একদম গোকর্নঘাটেই, তীব্র বাতাস আমাদের উড়িয়ে নিতে চাইবে, পতপত করে উড়বে পরণের কাপড়।

সন্ধ্যা হতে না হতেই বাসায় ফিরে যাবো হয়তো ট্যাংকের পাড়ের নিয়মিত আড্ডা শেষে। পরের দিনের পুরোন রুটিন ঠিকঠাক করে নেবো।

অনেকগুলো সম্ভাবনা থাকবে, কী হবে তা বেছে নেবো নিজের ইচ্ছেতেই, কলেজ জীবন এমনি হয়। এমনি হওয়া উচিত।

আনমনে ঘড়ির দিকে হঠাত চোখ পড়তেই হ্যাঁচকা টানে ফিরে আসি বর্তমানে। বাস্তবতা মনে করিয়ে দেয় স্মৃতিবিলাসের অসারতার কথা। ব্যস্ততা ভুলে তবু আরেকবার চলে যেতে ইচ্ছা করে কলেজের করিডোরে, ভালোই তো লাগছিলো

ফিরে গিয়ে।

[কৃতজ্ঞতা: কাছের কজন মানুষকে নানান খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করে বিভ্রান্ত করেছি, ওদের ধন্যবাদ দরকার মত তথ্য যুগিয়ে যাওয়ার জন্য।

বুনোহাঁসের কাছে কৃতজ্ঞতা ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে বানান ভুল শুধরে দেয়ায়।

লেখার সময় টের পেলাম, ধরণটা মিলে যাচ্ছে তাসনীম ভাইয়ের 'স্মৃতির শহরে'র সাথে। লেখা থামাতে পারছিলাম না, ভালোও লাগছিল খুব, তাই তাঁর দেখানো পথ ধরেই নিজের স্মৃতিতে ঘুরে এলাম। তিনি এ লেখা পড়বেন কিনা বলা মুশকিল, তবু তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা।

আর পাঠক, এত বড় একটা লেখা পড়ার ধৈর্য ধরে রেখেছেন, কৃতজ্ঞতা তাই আপনারও প্রাপ্য।

অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য।]

সচল নামঃ মর্ম
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/mormo

০১

হৈ চৈ শুনে দোতলার করিডোর থেকে নীচের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলাম। একদল পুলিশ বাঁশি বাজিয়ে হুংকার দিতে দিতে ঢুকছে কলেজের গেট দিয়ে।

মেট্রিক পাশ করেছি মাত্র। কলেজে ভর্তি হতে এসেছি। সেদিন কলেজ বন্ধ ছিল কোন কারণে শুধু ভর্তি সংক্রান্ত কাজ চলছে। ক্যাশে টাকা জমা দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। তখনই এই ঘটনা। তবু পুলিশ দেখেও আমরা গা করলাম না। আমাদের সাথে পুলিশের কোন সমস্যা নেই। ভর্তি হতে এসেছি, ভর্তি হয়ে চলে যাবো।

কিন্তু পুলিশ দোতলায় উঠে এল এবং বেরুবার সব পথ বন্ধ করে দিল। এটা দেখে শিরদাড়া বেয়ে চিক্কন একটা শীতল অনুভুতি লাগলো নেমে গেল নীচের দিকে। ওয়ারলেসে কথা শোনা যেতে লাগলো পুলিশ কর্তার, "স্যার পাইছি, সব হারামজাদারে ঘিরা ফেলছি। পালাতে পারবে না জী স্যার এক্ষুণি জানাচ্ছি কতজন।"

০২

১৯৮৪ সাল। এরশাদের স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের যুগ। রাজনীতি নিষিদ্ধ। প্রতিদিন নতুন নতুন আইনের নিষেধাজ্ঞা। রাস্তায় রাস্তায় মিলিটারী টহল। পুলিশের ট্রাক ছাত্রদের মিছিলে উঠে গিয়েছিলে যে যুগে সেই জলপাইযুগের কথা। নগর রাজনীতিতে চট্টগ্রাম সিটি কলেজ মার্কামারা কলেজ। শোনা যায় এই কলেজে কখনো পুলিশ ঢুকতে পারেনি রাজনীতির দাপটের কারনে। বাকশাল ছাত্রলীগের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি তখন। কলেজের একমাত্র ছাত্র সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগ।

পুলিশের মারমুখী ভঙ্গী দেখে ভর্তিচ্ছু বালকেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের চেয়েও বেশী কিছু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দোষটা কোথায় হলো ঠিক বুঝতে পারছি না। আজকে ভর্তি হওয়া নিষেধ ছিল নাকি?

পুলিশ অফিসার অধ্যক্ষের রুমে গিয়ে কি কি কথা বললো। ফিরে এসে গুঁফো পুলিশকর্তা আমাদের সবাইকে বললো, "চলো থানায় যেতে হবে সবাইকে।"

ছেলেরা একটু হৈ হৈ করে উঠলো। কি অপরাধ করলাম আমরা? ভর্তি হতে এসেছি সবাই। আমরা থানায় কেন যাবো?

ঘাড় ত্যাড়া একজন বললো, "আমাদের গ্রেফতার করছেন নাকি? আমরা যাবো না।"

পুলিশ এবার একটু মোলায়েম স্বরে বললো, "গ্রেফতার কেন করবো, শ্রেফ একটা ফরমালিটিজ আছে, থানায় গিয়ে ওটা করেই ছেড়ে দেবো। প্রিন্সিপ্যালের অনুমতি নিয়েছি। চলো সবাই।"

পুলিশের ঘেরাওতে নীচে নেমে এলাম সবাই। ছাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশজন হবে মোট। গেটের কাছে মাঝারি সাইজের প্রিজন ভ্যান দাঁড়ানো একটা। গা শিরশির করে উঠলো দেখে। কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের! সিনেমা টিভিতে প্রিজন ভ্যান দেখেছি, কিন্তু ততটা ভয়ংকর লাগেনি কখনো।

নীচে নামার পর পুলিশের গলার ভলিউম বেড়ে গেল দেখি। ওয়াকিটকিতে উচ্চস্বরে এবং বিজয়ীর সুরে উচ্চপর্যায়ের কোন কর্তাকে বলছে- "জী স্যার, সিটি কলেজের ভয়ংকর ৩৫ জন ছাত্রনেতাকর্মীকে অ্যারেষ্ট করেছি.....না স্যার একটাও পালাতে পারেনি। সবকটাকে ধরেছি....হে হে জী স্যার, আপনাদের দোয়ায়.....জী স্যার.....স্যার স্যার.....এক্ষুনি স্যার.....কোথায় স্যার? ডবলমুরিং? না স্যার.....কোতোয়ালী কাছে হবে। আপাততঃ কোতোয়ালীর লক আপে রাখি.....পরে নিয়ে যাবো অন্য জায়গায়।"

০৩

বিস্মিত হবার কোন অবকাশ না দিয়ে হুংকার দিয়ে প্রিজন ভ্যানে ঠেলে তোলা হলো। অন্ধকার ভ্যানটিতে বসার ব্যবস্থা আছে জনা দশেকের, দাঁড়ানোর মতো অবস্থা নাই, কুঁজো হয়ে আরো বারো চোদ্দজন ঢুকতে পারলো। জায়গা নেই আর।

দমবন্ধ হবার অবস্থা। তবু বিশজন ক্যাপাসিটির ওই গাড়ীতে ত্রিশজনকে ঢোকানো হলো ঠেসে।

ইঁদুর মারার কলের মতো লাগছে ভ্যানটাকে, একজনের কোলে আরেকজন, তার উপর আরেকজন। কি মর্মান্তিক অবস্থায় ঢোকানো হলো, না দেখলে বোঝানো যাবে না। তারপর ঘটাং করে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো পেছনের। শব্দটা যেন আমাদের আন্দামানের কালাপানির স্বাদ দিল।

গাড়ী চলছে। আমরা দুলছি অজানা আশংকায়। জীবনে কখনো এই পরিস্থিতিতে পড়বো কল্পনাও করিনি। বাসায় কেউ জানে না আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরাও জানি না আমাদের অপরাধ কী! কলেজে ভর্তি হতে এসে কোন বিপত্তিতে পড়লাম।

ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে ক্ষোভে, অসহায়ত্বে। কোথায় যাচ্ছে গাড়ীটা? সবাই বলাবলি করছে, সামরিক আইন এখন। মিলিটারীর হাতে তুলে দেবে ওরা। একাত্তরের কথা মনে পড়লো একাত্তরেও এরকম ধরে নেয়া যেত। তারপর আর ফিরে আসতো না। এখনও কি...!

এরকম নানান উদ্ভট চিন্তায় মাথা ঘুরছে। স্বাধীন দেশে কী দুর্দশা আমাদের! মিনিট দশেক পর গাড়ীটা থামলো কোথাও। ওই দশ মিনিটকে মনে হলো দশ ঘন্টা। গাড়ীর দরজা খুললে দেখতে পেলাম একটা প্রাচীন দালান। এই জায়গা আমাদের অচেনা। জীবনে কখনো এদিকে আসিনি। এটা কি থানা? নাকি জেলখানা? দালানের পলেস্তরা ওঠা দেয়াল দেখলাম। সবাইকে ওই দালানের ভেতর নেয়া হলো একপাল ভেড়ার মতো। সারি সারি পুলিশ দাঁড়ানো ভবনটি ঘিরে।

ভেতরে গিয়ে একজায়গায় লেখা দেখলাম - কোতোয়ালী।

বুঝলাম এটি থানা। ভেতরে লোহার শিকের গরাদ অলা দুটি কক্ষ। আমাদের সবাইকে ওখানে পুরে দেয়া হবে? বাইরের আলোবাতাসের জন্য প্রানটা কাঁদতে লাগলো হঠাৎ। আর কখনো দেখবো না পৃথিবীর আলোবাতাস? মনে হচ্ছিল আমাদের ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে। থানা পুলিশ আইন আদালত সবকিছুই অজানা। সব ছেলে সদ্য স্কুল পাশ, এখনো গোঁফের রেখাও দেখা যায়নি বেশীরভাগ ছেলের মুখে।

কিন্তু পুলিশের হম্বিতম্বি শুনে মনে হলো ভয়ংকর কোন সন্ত্রাসী দলকে ধরে এনেছে। একপাশে দাঁড় করিয়ে আমাদের সবার নাম ঠিকানা তালিকা করা হলো। আমি এবং আরেক বন্ধু শামীম সবচেয়ে পিচ্চি এই পুরো দলে। ওর মুখ শুকনো, আমারো। সে বলে, 'দোস্ত একটা খবর যদি বাসায় দেয়া যেত'।

আমিও ভাবলাম। কিন্তু বাসায় তো ফোন নেই। কি করে খবর পাঠাই।

০৪

যখন লম্বা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে গারদে ঢোকার অপেক্ষা করছিলাম, তখন নানান মন্তব্য ভেসে আসতে লাগলো। পুলিশদের মধ্যে দুজন মহিলা পুলিশ পেলাম। মনে হলো এরা অন্তত দয়ালু হবে। আস্তে করে বললাম, "আপা আমাদের কতদিন থাকতে হবে এখানে?"

মহিলা খনেখনে গলায় বলে উঠলো, "পুলিশের সাথে বেয়াদবী করো, আবার কদিন থাকতে হবে জিগাও? মজা বুঝবা। ছমাসের জেল হবে কমপক্ষে।"

আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না পুলিশের সাথে কোন বেয়াদবী করলাম! বললাম, "একটা খবর দেয়া যাবে না বাসায়?"

খনখনে গলা আবার বললো, "আগে মগজ ধোলাই হবে, তারপর খবর।"

বুঝলাম এর কাছে দয়ামায়া আশা করা বাতুলতা। চুপ করে রইলাম। আমাদের তালিকা করে বলা হলো, গরাদের ভেতরে ঢোকো সবাই। শুনে হু হু করে কান্না বেরিয়ে এল ভেতর থেকে লজ্জায় চেপে রাখলাম। সবাই তো কাঁদছে না। এমনকি কিছু কিছু ফাজিল ছেলেপেলে এর মধ্যেও মজা করছে। নার্ভ আছে ওদের। তবে ঢুকতে বলাতে সবাই ঢুকতে রাজী না।

কয়েকজন ঘাড়ত্যাড়া বলে উঠলো, "ওখানে সব চোর ছ্যাছড় ওদের সাথে আমরা থাকবো কেন। আমরা রাজবন্দী। আমাদের আলাদা রাখতে হবে "

ওরে বাপস। এই প্রথম একটু আশা জাগলো। সম্মানিত লাগলো নিজেদের। আমরা তাহলে রাজবন্দী? রাজবন্দীদের সাথে সম্মান দিয়ে কথা কইতে হয়।

পুলিশ অফিসার তেড়ে উঠতে গিয়েও কি মনে করে আবার বললো, "ওই.....

ভেতর থেকে চোরগুলানরে বাম পাশের সেলে ঢোকা, তারপর এদেরকে ডানদিকে ঢোকা।"

০৫

ছোট্ট একটা হাজতখানা। লোহার গরাদের দরোজা। ঢোকার সাথে সাথে স্বাগত জানাল তীব্র কটু মলমুত্রীয় গন্ধ। এটি একটি প্রশ্রাবখানাও বটে। একই ঘরের একটা কোনে ইঠের ছোট একটা দেড়ফুটি পার্টিশান। ওখানেই হাগা-মুতা।

গন্ধে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে আসতে চাইছে। কি করে মানুষ এখানে থাকে দিনরাত? সিনেমায় তো দেখায় কি সুন্দর জেলখানা। ডোরাকাটা জামা পরে ঘুরে বেড়ায়, গান গায়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারদিক। বাস্তব আর সিনেমার ফারাক এত বেশী দেখে আরো মুষড়ে পড়লাম।

এত মানুষ একসাথে! দাঁড়ানোর জায়গাও হচ্ছে না। প্রায় অন্ধকার সেল। পেশাবখানার পাশে ছোট্ট একটা খুপড়ি জানালা। ওদিকে উচু পাহাড়ের মতো উঠে গেছে। আকাশ দেখা যায় না। মাটি দেখা যায়।

হায় খোদা এই নরকে কতমাস থাকতে হবে?

বেশীরভাগ ছেলে অচেনা। আমরা দুজনই কেবল একই স্কুলের। বোবা হয়ে নোংরা মেঝেতেই বসে পড়লাম ভীড়ের মধ্যে। জল্পনা কল্পনা চলছে, এরপর কী হবে! কে আমাদের বাঁচাতে আসবে!

একজন বললো, এইসব ক্ষেত্রে কলেজ কতৃপক্ষই একমাত্র ভরসা। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল যদি আসে, তাহলে আমাদের ছেড়ে দেবে। ওরা আসার আগেই তো বলেছিল ছেড়ে দেবে ফরমালিটিজ করে। তাছাড়া প্রিন্সিপ্যাল স্যার নিজেই তো দেখেছে আমরা কিছু করিনি। নির্দোষ ছাত্ররা কেন শাস্তি পাবে!

দুপুর পেরিয়ে গেছে। কারো কোন খবর নেই। গরাদের বাইরে থেকে এক সেপাই মারফত শোনা গেল, আমাদের কোর্টে চালান করে দেয়া হবে কালকেই। তারপর কোর্ট যদি রায় দেয় তিনমাস থেকে ছমাসের জেল হবে।

ভয়ে বুদ্ধিশুদ্ধি সব গুলিয়ে গেছে। শামীম কাঁদছে। বড়লোকের ছেলে। এ অবস্থা কখনো হবে কল্পনা করেনি। এক ফাঁকে একটা কাজ করলাম দুজনে। বয়স্ক দয়ালু এক সিপাইকে পেয়ে হাতে বিশটা টাকা দিয়ে বললাম, একটা নাম্বারে ফোন করে জানাতে আমাদের অবস্থান। নইলে চিন্তায় মা অজ্ঞান হয়ে যাবে। পুলিশ টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু কথা রাখবে কিনা জানিনা।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে দেখা গেল মোটামুটি সবাই স্থির হয়েছে। ছোট্ট জায়গার ভেতরেও একেকটা দল গোল হয়ে বসে নানান আড্ডা জমিয়ে ফেলেছে। একটা দলতো তাস খেলার আসর বসিয়ে দিয়েছে। ওদের দেখে মনে হলো পিকনিকে এসেছে। কি আনন্দে তাস পেটাচ্ছে।

কেবল আমি আর শামীম চুপচাপ দলবিহীন। বসে আছি কখন আত্মীয় পরিজনের কাছে খবর পৌছুবে আর অলৌকিক কোন উপায়ে ছাড়া পেয়ে যাবো।

০৬

কিন্তু বাইরের বাতাস ভালো না।

তিনটার দিকে খবর এলো সামরিক আইনের আওতায় যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের কাউকে ছমাসের আগে ছাড়া হবে না। যতই নবাবপুত্তুর থাক এর ভেতর। এতক্ষণ একটা ক্ষীণ আশা নিভু নিভু জ্বলছিল। কারণ আমাদের মধ্যে একটা নেভি কমান্ডারের ছেলেও গ্রেফতার হয়েছে। তার বাপ নিশ্চয়ই তদবির করে ব্যবস্থা করতে পারবে।

সেই আশার গুড়ে বালি পড়লো ওই সংবাদ পেয়ে।

আরো যাদের উচ্চপর্যায়ের আত্মীয় স্বজন আছে তারা সবাই খবর পাঠালো টেলিফোনে সেই দয়ালু সিপাই মারফত। চারটার দিকে ভিজিটর আসা শুরু হলো। কারো বাপ, কারো চাচা, কারো মামা। সবাই হাতে করে খাবারদাবার আনছে। কেউ কলা, কেউ বিস্কুট, কেউ কেক। এই দুঃসময়ে একটা জিনিস খুব ভাল লাগলো। যার জন্যই খাবার দাবার আসে, কেউ একা খাচ্ছে না। মিলেমিশে ভাগাভাগি করে খায়। ওই ভাগাভাগির হৈ হৈ শব্দে কিছুক্ষনের জন্য ভুলে গেলাম আমরা বন্দী।

আমার বাবা দেশের বাইরে তখন। চাচা এলো খবর পেয়ে। হাতে বিরিয়ানীর প্যাকেট। গরাদের ফাঁকে চাচাকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করলো।

চাচা তখন জাসদের রাজনীতি করে, পরিচয় লুকিয়ে এসেছে। ফিসফিস করে বললো, আপাততঃ কেউ সুপারিশ করতে পারছে না ছাড়ানোর জন্য। কোন নেতাকে পাওয়া গেল না। সবাই আত্মগোপনে চলে গেছে

ততক্ষণে ভয়টা একটু সয়ে এসেছে। অভিযোজন ক্ষমতা সবারই আছে অল্প বিস্তর। এই জায়গায় দীর্ঘ সময় কাটানোর মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিতে হবে। এরশাদ হারামজাদা তো আর অল্পসময়ে যাচ্ছে না।

কিছু কিছু বেয়াড়া পোলাপান এখান থেকেই এরশাদ বিরোধী শ্লোগান দিচ্ছে। পুলিশকে দেখে ঠোলা ঠোলা করে চীৎকার করলো। আমি ওদের বেপরোয়া আচরন দেখে ভীত হলাম। মনে মনে বলি, দোহাই তোদের একটুখানি চুপ কর! পুলিশের খাঁচায় থেকে এত সাহস! পুলিশ অন্ততঃ এখনো মারধর করেনি। এরপর তো ধোলাই শুরু হবে। ইতিমধ্যে গরাদের ফাঁক দিয়ে কয়েকবার হুমকি দেয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে, "মুন্ডু ধরে ধরে ধোলাই চলবে।"

বিকেলের মধ্যে সারা চট্টগ্রাম খবর হয়ে গেল। লোকজন এসে জড়ো হচ্ছে থানার বারান্দায়। অভিভাবককুল। শোনা গেল পুলিশের ডিসি আসবেন। তিনি দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন কি করা যায়। ডিসি সাহেব যেন দয়ালু হয় আমরা সেই দোয়া করতে লাগলাম। ছাড়া পাবার ক্ষীণ একটা আশা সন্ধ্যার পরপর উজ্জ্বল হতে লাগলো। ডিসি চাইলে আমরা ছাড়া পেতে পারি। আমরা আইন ভঙ্গকারী ছিলাম না এটা প্রমাণ করতে হবে।

০৭

গ্রেফতারের আসল ঘটনা জানা গেল কিছুক্ষণ পর।

সেদিন সিটি কলেজের আশেপাশে ১৪৪ ধারা জারি করা ছিল। একে তো সামরিক আইন। তার উপর ১৪৪ ধারা। ওসবকে কাঁচকলা দেখিয়ে সিটি কলেজের ছাত্র সংসদের নেতারা মিছিল করেছে কলেজের ভেতর। এরশাদের বিরূদ্ধে শ্লোগান দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ আসার আগেই পেছনের দরোজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। পুলিশও জানতো যারা মিছিল করেছে তারা নেই কলেজে। তবু দায়িত্ব বলে কথা। পারফরমেন্স দেখাতে কাউকে না কাউকে গ্রেফতার করতেই হবে! ছাত্র নামের ছাগল হলেও চলে তার। তাই পুলিশ নিরীহ কলেজ বালকদের ভয়ংকর রাজনৈতিক সন্ত্রাসী দেখিয়ে গ্রেফতার করে।

বিপত্তি লাগায় সেই নৌ-কমান্ডার ও আরো কয়েকজন ছাত্রের প্রভাবশালী অভিভাবক। তারা ডিসিকে জানায় প্রমাণ করতে পারলে ওদের জেলে পাঠানো যাবে, নইলে নয়। তাই ডিসিকে আসতে হচ্ছে থানায়। তিনি দেখে সিদ্ধান্ত দেবেন।

রাত আটটার দিকে আমাদের সবাইকে গরাদের বাইরে আনা হলো। তিনজন বাদ গেল। যে তিনজন পুলিশকে ঠোলা ঠোলা করেছিল তাদেরকে ভেতরে থাকতে বলা হলো। বাকীরা লাইন ধরে দাঁড়ালো। বলা হলো ডিসি সাহেব এসেছেন সবাই যেন ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র হাতের মধ্যে রাখে। যাদের হাতে ভর্তির প্রমাণ পাওয়া যাবে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে।

প্রায় সবারই ছিল ভর্তির কাগজ।

ডিসি সাহেব এসে ঢুকলেন। খুঁজলেন ভয়ংকর সন্ত্রাসীদের। ওসি সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় সেই সন্ত্রাসী দল?"

ওসি আমাদের দিকে ইশারা দিয়ে দেখালো।

ডিসি এসে একে একে আমাদের কাগজপত্র দেখলেন। নাম ঠিকানা টুকটাক প্রশ্ন করলেন। পুলিশকে ঠোলা বলি কিনা জিজ্ঞেস করলেন। ডিসি ভদ্রলোক প্রত্যাশার চেয়ে দয়ালু এবং রসিক আচরন করলেন। সব দেখে টেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে এক ধমক দিলেন ওসিকে। বললেন, "এরাই আপনার সেই সন্ত্রাসীদল? এই বাচ্চাগুলো? এগুলোর তো নাক টিপলে দুধ বেরুবে এখনো। যত্তসব। সারাদিন ধরে এদের বেঁধে রেখেছেন এখানে? কিছু খেতে দিয়েছেন?"

এতক্ষণের প্রতাপশালী ওসির চেহারা তখন দেখার মতো হলো। "না স্যার ওরা কিছু খেতে চায়নি... এই ছেলেরা, তোমরা কিছু খাবে এখন?"

"জিজ্ঞেস করার দরকার কি? এক্ষুণি ওদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করেন, আর ছেড়ে দেন সবাইকে যাদের প্রমাণপত্র আছে।"

ডিসির কথা শুনে আমাদের তো ঈদ হয়ে গেল। হৈ হৈ করে কোলাকুলি মাতামাতি। বিশাল এক বোঝা নেমে গেল বুকের উপর থেকে।

ডিসি সাহেব বিদায় নেবার আগে আমাদের কাছে এলেন। আমার সামনে এসে বললেন, "তোমাদের নির্দোষ প্রমাণ পাওয়া গেল বলে ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু যদি আবার কোন গন্ডগোলে তোমাদের নাম আসে, তাহলে কিন্তু সবার ঠিকানা লেখা আছে। বাসা থেকে ধরে নিয়ে আসা হবে। কলেজ যতদিন বন্ধ থাকবে কলেজে আসবে না।"

আমি ফাঁকতালে একটা রসিক প্রশ্ন করলাম, "স্যার, প্যান্ট পরে রাস্তায় বের হওয়া যাবে তো?"

তিনি রসিকতা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে বললেন। "নিশ্চয়ই যাবে।"

সেই সময়কার পরিস্থিতি যারা জানেন না তাদের জন্য বলি-

এরশাদের ওই সময় দেশে এমন দুর্বিষহ আতংক সৃষ্টি করেছিল পুলিশ বাহিনী প্যান্ট পরা কাউকে দেখলেই মনে করতো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ছাত্র দেখামাত্র গ্রেফতার করা ফরজ মনে করতো। রীতিমত পুলিশের খাদ্যে পরিণত হয়েছিল গোটা ছাত্রসমাজ। মনে পড়ে সেই সময় প্যান্ট পরা বাদ দিয়ে লুঙ্গি ধরেছিলাম বেশ কিছুদিন।

কুলাঙ্গার এরশাদের প্রতি ঘেন্না দিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের কলেজ জীবন।

সচল নামঃ নীড় সন্ধানী
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/hrrh69

উত্তর ছাত্রাবাস

...ফারুক হাসান

চারদিকে একদম আলকাতরা লেপা অন্ধকার। মাত্র শুয়েছি, এর মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে কারো গলা শুনতে পাচ্ছি, ধর, ধর। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, একটানা শো শো আওয়াজে বাতাস, ঠান্ডা, মিহি একটা স্পর্শ। গোলাগুলির শব্দের বদলে এবার দ্রিম দ্রিম শব্দ। কে যেন অনবরত টিনে বাড়ি মারছে। পাশে তাকিয়ে দেখি, শেলি নিজের গায়ে লেপ টেনে পাশ ফিরে শুতে শুতে বলছে, শালার একটু যে আরাম কৈরা ঘুমাবো তারও উপায় নাই, আবার লাগছে উত্তরে-দক্ষিণে।

ঢাকা কলেজের উত্তর ছাত্রাবাসের নিচতলায় ১০৯ নম্বর রুমে তিনটা বিছানা। দরজার পাশেরটা শেলির, আর্টসের ছাত্র, বাড়ি নরসিংদী। শেলি আমার দেখা সবচেয়ে সুদর্শন এবং স্মার্ট ছেলে। চমৎকার ফিগার, যেকোন পোশাকের জন্য হ্যাঙ্গার হিসেবে চমৎকার। লম্বা, ফর্সা, তীক্ষ্ণ নাঁক, ধনুকের মত বাঁকানো দুই ভ্রু, মাথা ভর্তি চুল, আজ বাবরি ছাট তো কালকে রাউন্ড। ১৯৯৬ সাল, তখনও স্পাইকের চল হয়নি। সাথে যোগ হয়েছে যাবতীয় হাল ফ্যাশনের পোশাক। সারাক্ষণ বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈচৈ করতে পছন্দ করে, ভালো ক্রিকেট খেলে আর ফিডব্যাক ও মাকসুদের চরম ভক্ত। 'বঙ্গাব্দ ১৪০০' এলবাম পুরোটা মুখস্থ।

মাঝের বিছানা সুমনের, কমার্সের ছাত্র, বাড়ি কিশোরগঞ্জ। সুমন আর শেলির স্কুল একই ছিল, দুজনে ছোট থেকেই হোস্টেল জীবনে অভ্যস্থ। হলের গেট থেকে বের হওয়া মিছিলে ফার্স্ট ইয়ারের ডাক পড়লে ক্যাডার ভাইদের ঠিকই ম্যানেজ করে ওরা কেটে পড়তে পারতো, এছাড়া মানিক মিয়ার দোকানে বাকিতে খাওয়া, নিউমার্কেটে টাংকি মারা, বঙ্গবাজারে গিয়ে মুলামুলি করে আড়াই হাজার দাম চাওয়া জিন্সের প্যান্ট দুইশো সত্তর টাকায় কেনা, ফার্মগেটের ছন্দ সিনেমা হলে এক টিকিটে দুই ছবি দেখে ফেরার পথে তাবলীগ পথ রোধ করলে মসজিদে গিয়ে এশার নামাজ আদায়, ফ্রি ফটোকপি করানো, যাদব মিষ্টান্ন ভান্ডারে ফাও মিষ্টি খাওয়াসহ ইত্যাদি ইহজাগতিক কাজকর্মে এদের দুজনের কাছে আমি নিতান্তই কড়ে আঙ্গুলের সমান।

দরজার ঠিক উল্টোপাশে রুমের একদম ভিতরের দিকের বেডটা আমার, ডিপার্টমেন্ট - সায়েন্স।

সুবোধ এবং আপাত নিরীহ চেহারার আমাকে মানুষ করার দায়িত্ব তাই ওরা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে লাগলো। প্রথম রাতেই আমার তোষকের নিচে তিনটা গুপ্তবাবুর চটি বই গুঁজে দিলো সুমন। সুমনকে সবাই ডাকতো 'চটি সম্রাট' বলে। ও নীলক্ষেত থেকে দুই টাকা দিয়ে চটি বই ভাড়া করে এনে নিজে পড়ার পর অন্যদেরকে এক টাকায় ভাড়া দিত। শর্ত একটাই, বই ভেজানো যাবে না।

এরপর শুরু হলো আমাকে টুয়েন্টিনাইন খেলা শেখানো। সুমন, শেলি, শেলির আরেক বন্ধু পল্লব আর আমি - এই চারজন। সবই ঠিক ছিল, কিন্তু গোল বাধলো যখন খেলা শেখার তিন লিডের মাথায় রুহিতনের গোলাম চুরি করে দুইবার খেলে ফেললাম। ভেবেছিলাম, ওরা ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি তো আর জানি না যে যাদের সাথে খেলতে বসেছি এরা একেকজন তাস খেলা ধরেছে প্রাইমারি স্কুলে আর এক দান খেলার পরই বলে দিতে পারে কার হাতে কি তাস আছে।

তবে এহেন চুরিচামারি দেখে হতভম্ব সবাই অবশ্য বুঝে গেল, আমাকে দিয়া হবে।

ফার্স্ট ইয়ারের সবার সীট একতলায়। দোতলা আর তিনতলায় বেশির ভাগই সেকেন্ড ইয়ার, হয়ত দুয়েকজন অনার্সের। হল অফিসও দোতলায়। হলের গেট দিয়ে ঢুকতেই বামপাশের ১১১ নম্বর রুম হলো ক্যাডার রুম। সুমন এসে একদিন বললো, ওর কাছে এক ক্যাডার বড়ভাই একটা পিস্তল রাখতে বলেছে রাতের জন্য, সকালে এসে ফেরত নিয়ে যাবে। বেচারা তো ভয়ে অস্থির। ১০৮এ তখন লিটন নামে খুব সহজ সরল একটা ছেলে উঠেছে, দেশের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। সুমন ভয় পেয়েছে দেখে বললো, 'বন্দু (বন্ধু), ডরাইয়ো না, বেশি ডর করলে জিনিসটা আমার লকারেই রাখুম নে।'

মাস খানেক পরে দেখি, লিটন একটা মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে। সাধারণত অনার্স কিংবা মাস্টার্সের কারো সেটা করার কথা। ঢাকা কলেজে তখন ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ - সাঈদ গ্রুপ আর মোশতাক গ্রুপ। মাঝে ছোটখাটো নিরপেক্ষর দলে আছে মাস্টার্স হলে থাকা পলাশ গ্রুপ (পলাশ পরে ঢাকা উত্তর ছাত্রলীগের সম্ভবত সভাপতি ছিল এবং সন্ত্রাসীর গুলিতে মারা যায়), আরেকটা সিরাজগঞ্জ গ্রুপ। লিটনের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল আব্বাস। আমরা ডাকতাম ট্যারা আব্বাস। দুজনেই আর্টসের ছাত্র, নাম লেখালো মোশতাক গ্রুপে। প্রায় চোখের সামনে দেখলাম নিতান্তই সহজ সরল

মেধাবী দুটি ছেলে কীভাবে ক্যাডার হয়ে গেল। তার প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে বইমেলা থেকে ফেরার পথে একদিন রাস্তায় হুমায়ূন আজাদকে গুরুতর জখম করলো সন্ত্রাসীরা। আর সেই মামলায় অনেক দিন জেল খাটল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার ছাত্র আব্বাস। আর লিটনের শেষ খবর শুনেছিলাম, কারা যেন একদিন ওকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছে কুঁপিয়ে।

পাশের রুম ১০৮ এ থাকতো লিটন, বাবু আর শিমুল। বাবুর সাথে কলেজ থেকে বের হবার পর আর দেখা হয় নি। ভবিষ্যতে কি হবে? শিমুল ছিল এসএসসিতে মানবিক বিভাগে কুমিল্লা বোর্ডের প্রথম স্ট্যান্ড। এই ছেলে মানবিকে পড়ত, কিন্তু তার নেয়া বিষয়গুলোর বেশিরভাগই ছিল আমরা যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তাদের মতন। তখন মানবিকে পড়লেও ঐচ্ছিক হিসেবে বিজ্ঞানের কিছু বিষয় নেয়া যেত। শিমুল নিলো উচ্চতর গণিত আর পরিসংখ্যান। এই ছেলে পরে অর্থনীতি পড়বে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শিমুলের একটা প্রেমিকা ছিল, স্কুলে পড়তো, ক্লাস সেভেনে। এই নিয়ে তার শরমের শেষ ছিল না। আমরা খ্যাপাতাম, 'শিমুল, এরে বিয়া করলে কিন্তু বাল্যবিবাহ আইনে তোমার জেল হয়া যাইতে পারে।' শিমুল একদিন টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা একটা গান শুনিয়েছিল। একদিকে শিমুল গাইছে, 'মেঘে কেন লুকোচুরি খেলছে চাঁদ।' অন্যদিকে একটা বালিকা লাজুক গলায় খুব আস্তে করে বলছে, 'তোমার ঐ চাঁদমুখটা দেখে কি!' সেই রেকর্ড করা টেপ শিমুলের কাছে পুরোটা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনজুড়ে ছিল।

সেকেন্ড ইয়ারে সবাই যখন তিনতলায় উঠে এলাম, আমার রুমমেট হলো পাগলা বায়েজীদ। আমাদের এই বায়েজীদ বোস্তামীও ছিল এসএসসি'তে স্ট্যান্ড করা, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্র।

লিটন আর বায়েজীদ ছিল একই এলাকার, লিটন আমাদের সবাইকে বলতো 'বন্দু' আর শুধু বায়েজীদকে ডাকতো 'মামু'। প্রায়ই দেখা যেত বিশাল এক রাম দা হাতে নিয়ে লিটন বায়েজীদ কে তিন তলার এ মাথা থেকে ও মাথা তাড়া করছে। বায়েজীদ কোনদিনই ইয়ারকি'টা ধরতে পারতো না, বিস্ফোরিত চোখে জান হাতে নিয়ে সে আমার চৌকির তলে লুকাতো।

লিটন আর আব্বাস ওদের মাল ঠিক আছে কি না সেটা পরীক্ষা করতো তিন তলা থেকে পাশের গাছে বসা কাক শিকার করে।

ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার, ক্যাডার, ননক্যাডার মিলে হলে তখন অনেক ছাত্র আর বহিরাগত। এর মধ্যেই যার যার সার্কেল। রাসেল সবসময় একটা টিনের বাক্স নিয়ে ঘুরত, ভেতরে তার প্রেমিকার পাঠানো সব প্রেমপত্র। ওর কাজই ছিল আমাদেরকে চান্স পেলেই গোটা গোটা অক্ষরে লেখা সেইসব চিঠি রসিয়ে রসিয়ে পড়ে শোনানো। এর মধ্যে কিছু ছিল খুবই আপত্তিকর কথাবার্তা, কিন্তু ব্যাটা সেইগুলো শুনিয়েই আনন্দ পেতো সবচেয়ে বেশি।

আর শ্যামল, পুরো নাম আশরাফুল ইসলাম শ্যামল। সে প্রথম থেকেই সবার মধ্যে একটা মিথ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় যে হুমায়ূন আহমেদের ছোট মেয়ে শিলা আহমেদ নাকি ওর প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে। টেবিলে হুমায়ূনের বই, বিছানায়, হাতেও। মুখে মাঝে মাঝে রহস্যময় কথাবার্তা। অনন্ত নক্ষত্রবীথি, 'আই অ্যাম নো বডি', 'আমার বন্ধু কেবল আনিস সাবেত'- এইসব কঠিন কঠিন বাক্য। এই ছেলের হাতের লেখা ছিল খুব চমৎকার। আর ছিল ক্রিকেটে দুরন্ত আগ্রহ।

শ্যামলের খুব প্রিয় ছিল মাহতাব, আমরা ডাকতাম ম্যাঁপু। ম্যাঁপু শ্যামলের সব কথা বিশ্বাস করতো, ও জানতো যে 'হি ইজ নো বডি', ভাবতো হয়তো 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি' বলে আসলেই কিছু আছে, চাইতো আনিস সাবেতের সমকক্ষ হতে, তাকে না জেনেই। শ্যামল আর ম্যাঁপু গভীর রাতে খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে যেত মিরপুর রোড ধরে আসাদ গেট, মানিক মিয়া এভেনিউ, ফার্মগেট, তারপর গ্রীনরোড হয়ে আবার ঢাকা কলেজ। ওরা হাঁটতে ভালোবাসতো, ভালোবাসতো চাঁদের আলো।

ঠিক জিয়ার মত। জিয়া, সৈয়দ জিয়া উদ্দিন, বাড়ি দিনাজপুর। জিয়াকে আমরা এখনও ডাকি পাগলা জিয়া। ওর গলায় 'মেহবুবা মেহবুবা' গানটা শুনে হাসতে হাসতে খাবি খায় নাই এমন মানুষ মেলা ভার। আরেকটা গান গাইতো জিয়া, 'পিয়ারে পিয়ারে'য়ের প্যারডি - 'জিয়ারে জিয়ারে'।

এই ছেলেটা সবার কাছে সারাজীবন হয়ে থাকবে ঈর্ষার পাত্র- ওর খামখেয়ালিপনার জন্য। উত্তর ছাত্রাবাসের সবচেয়ে প্রতিভাবান এই ছেলে পরে নৌবাহিনীর চাকরিতে যোগ দিতে গিয়েও গেট থেকে ফিরে আসবে, বুয়েটে ভর্তি হয়েও পড়ালেখা বাদ দিয়ে তারেক আনামের নাট্যদলে 'প্রজাপতি' নাটক করে

বেড়াবে, শেষমেষ সাধারণ বিএসসি পাশ করে তাকে দেখা যাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আইবিএ'র বারান্দায়।

নাহিদ নামের আমাদের এক বন্ধু ছিল যে ভালোবাসতো সাহিত্য। নাহিদ, সাইফ, শ্যামল আর আমি মিলে হাতে লিখে একটা পত্রিকা বের করেছিলাম, 'স্বাপ্নিক'। নামটা দিয়েছিল রাজন। স্বাপ্নিক - যে স্বপ্ন দেখে, যার সম্পাদক ছিল নাহিদ, মুক্তার মত হাতের লেখায় কবিতা লিখতো, যার ডায়রিতে লেখা ছিল, Behold! I dont give a little charity, When I give, I give myself, যে বর্তমানে সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। হয়ত সে এখনও স্বাপ্নিক, জেনারেল হয়ে কবিতা লিখবে আবার।

এক যুগ আগে এইসব এক প্যারার চরিত্ররা আদতে ঢাকা কলেজের উত্তর ছাত্রাবাসে থাকতো। দেড় বছরের ঢাকা কলেজ জীবনে সত্যিকারের কলেজ করা এদের পক্ষে খুব বেশি সম্ভব হয় নাই, ঢাকা কলেজে আসলে কেউ কলেজ করে না। তাদেরই একজন দ্বিতীয় বর্ষে মাত্র দুটি ক্লাস করেছিল, একটা মসিরউদ্দিন স্যারের রসায়ন ক্লাস, আরেকটা ফেরদৌসি ম্যাডামের বাংলা ব্যকরণ। অবশ্য প্রথম বর্ষে হরষিত বালা স্যারের ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাস সে খুব মনোযোগ দিয়ে করত। 'দ্য গিফট অফ দ্য মেজাই' গল্পের নায়িকা ডেলার চুলের বর্ণনার অনুবাদে সে লিখেছিল, 'যবে কুন্তল চুমিল ভূতল/ঝরঝর ঝর্ণা/ঝরিল প্রাণে', ইত্যাদি।

এইসব চরিত্রদের সৃষ্টিস্থল এক হলেও এটা সত্য যে তাদের নিয়ে কেউ কখনো কোন উপন্যাস লিখতে ব্রত হয় নাই।

সচল নামঃ ফারুক হাসান
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/faha

থ্রী চিয়ার্স ফর গ্রুপ ওয়ান

...কাকুল কায়েশ

০১

নটরডেম গ্রুপ ওয়ানের ছেলেপেলেরা সাধারনতঃ একটু পড়ুয়া অথবা আঁতেল প্রকৃতির হয় বিধায় অন্যান্য গ্রুপের সাথে এদের ঘনিষ্ঠতা একটু কমই হয়। যার ফলে এদেরকে অন্যান্য গ্রুপের ছেলেপেলেরা খুব বেশী চিনে না, বা সেরকম খাতিরও হয় না। যার ধারাবাহিকতায় এদের এক্সপোজারও হয় অনেক কম। তবে, আমি এদিক থেকে নিজেকে খুবই ভাগ্যবান মনে করি কেননা একটা বিশেষ ঘটনার কারনে কলেজে আমি বেশ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলাম।

এই খ্যাতিটা আমাকে কিরূপ অহংকারী করেছিল, তার একটা ছোট্ট উদাহরন দেই প্রথমে।

এইচএসসির পর প্রথমবার ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম। প্রথমদিনের ক্লাস শেষে আমরা বেশ কয়েকজন নিজেদের মধ্যে আড্ডা দিচ্ছি- মূলত কেউ কারো নাম জেনে নিচ্ছি, কে কোন কলেজ থেকে এসেছে এসব দিয়ে পরিচিতি পর্বটি সেরে নিচ্ছি।

একটা ছেলের সাথে আমার নাম পরিচিতি হয়ে গেছে বেশ আগেই। খানিক পর ওকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কোন কলেজ থেকে এসেছ যেন?'

সে বলল, 'নটরডেম!'

'কোন গ্রুপ?'

বলল, 'গ্রুপ সেভেন!'

আমি রীতিমত বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলাম। অবাক চোখে কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে বেশ আহত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি গ্রুপ সেভেনের ছেলে হয়ে আমাকে চিনতে পারলা না? অবিশ্বাস্য!!

আমার এই বিস্মিত চেহারা দেখে ও বিটকেল প্রশ্নটি শুনে সেও কেমন যেন বিব্রত বোধ করল একটু। একটু মাথা চুলকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ও, তোমার নামটা যেন কি বললে একটু আগে?'

আমি প্রায় চিৎকার করে বললাম, 'কা-য়ে-য়ে-শ!'

সে একটু চিন্তা করে খানিকটা উল্লসিত কন্ঠে বলল, 'ওহ আচ্ছা, তুমিই তাহলে কায়েশ। স্যরি, আমি তখন নামটা খেয়াল করি নাই।'

তারপরও আমি ছাড়লাম না ওকে। সেই একই বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু...কিন্তু তুমি আমার চেহারা দেখেও আমাকে চিনতে পারলা না? আমি কিন্তু খুব অবাক হচ্ছি!'

ও হাসিমুখে জবাবটা দিল, 'কিভাবে চিনব বল? তুমি তো সেদিন হেলমেট পড়ে ছিলে!'

অগত্যা শান্ত হলাম আমি। হুমম, কথা সে ঠিকই বলেছে, আমি তো সেদিন হেলমেট পড়েই ছিলাম!

যাই হোক, কলেজ জীবনের যে ঘটনাটা আমার স্মৃতিকোষ্ঠে আজীবনের জন্য ঠাঁই নিয়েছে, যেখানে কখনোই কোন ধূলার আস্তরণ পড়বে না, সেই গল্পটা বলেই ফেলি আজকে।

০২

ফার্স্ট ইয়ারের মাঝামাঝি। ক্লাসের এক ছেলে আসাদ এসে ঘোষণা দিল, আন্তঃগ্রুপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যারা যারা খেলতে আগ্রহী তারা যেন আগামীকাল মাঠে আসে, তারপর তাদের প্রত্যেকের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে গ্রুপ-ওয়ান ক্রিকেট টিম চূড়ান্ত করা হবে।

আমার রক্তে হচ্ছে ক্রিকেট, বকশীবাজারের ছেলেরা আসলে জন্মই নেয় হাতে ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে। ক্রিকেটার হিসেবে বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় আমার বেশ সুনামও আছে, অবশ্য ক্লাসের দু-তিনজন ছাড়া কেউ সেটা জানে না। খেলাটা কাঠের বলে হবে জেনে বেশ আগ্রহ বোধ করলাম। এছাড়াও পরে যখন শুনলাম অন্যান্য গ্রুপের আমার কয়েকজন বন্ধুও খেলবে তাদের নিজেদের গ্রুপের হয়ে, আগ্রহের মাত্রাটা আরেকটু বেড়ে গেল।

নির্দিষ্ট দিন আমরা টেনিস বলে হালকা প্র্যাকটিস করলাম। আসাদ আমাদের পারফরমেন্স দেখে দেখে পনের-ষোল জনের একটা দল চূড়ান্ত করে ফেলল। বলার অপেক্ষা রাখে না, আসাদ নিজেই নিজেকে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করল।

পরদিন আমরা গ্রুপ ফাইভের সাথে টেনিস বলেই একটা প্র্যাকটিস ম্যাচ খেললাম। ভয়ংকর ফর্মে ছিলাম সেদিন, বিপক্ষ বোলারদের জান পানি-পানি করে পেটালাম। (আমার এই পিটুনিটা অন্যান্য গ্রুপের অনেকেও মনে রেখেছিল! বেশ কিছুদিন পরে গ্রুপ ফোরের এক বন্ধু আমাকে বলেছিল, 'তোরে আমি ফার্স্ট চিনসি কবে জানিস? যেদিন তুই গ্রুপ ফাইভের ওই বোলারগুলারে গরু-পেটানোর মত পিটাচ্ছিলি!)।'

তো ম্যাচটি শেষে আমাদের দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় এসে আমাকে ধরল, 'আমরা আসাদকে নয়, ক্যাপ্টেন হিসেবে তোমাকেই চাই। দ্য বেস্ট প্লেয়ার শুড বি দ্য ক্যাপ্টেন।'

আমার আপত্তির কোন কারণ ছিল না, ক্যাপ্টেন্সিটা আমি সবসময়ই খুব উপভোগ করি। আমি ওদেরকে সায় দিয়ে বললাম, 'আমি রাজি।'

ওরা যেয়ে তখন আসাদকে তাদের সিদ্ধান্ত জানাল। আসাদেরও আসলে আর কিছু বলার ছিল না, কারণ ক্রিকেটে যুক্তির কাছে আবেগের কোন স্থান নেই।

যার ফলশ্রুতিতে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, আমিই এবারের টুর্নামেন্টে গ্রুপ ওয়ানকে নেতৃত্ব দেব।

০৩

বেশ জাঁকজমকপূর্ণ একটা টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে এবার কর্তৃপক্ষ। টুর্নামেন্টটা নিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মধ্যেও ব্যাপক আগ্রহ-উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছে ইতিমধ্যেই।

খেলা হবে নটরডেমের মাঠেই। পিচের উপরে ম্যাট বসানো হয়েছে (ম্যাটে ক্রিকেট খেলা আর পার্থের ওয়াকা গ্রাউন্ডে ক্রিকেট খেলার মধ্যে খুব বেশী তফাত নাই কিন্তু)।

খেলা হবে টুয়েন্টি-টুয়েন্টি (সাল কিন্তু ১৯৯৫!)। সায়েন্স, কমার্স, আর্টস সব গ্রুপই অংশ নিচ্ছে টুর্নামেন্টে। ফার্স্ট রাউন্ড হচ্ছে নকআউট রাউন্ড, এরপর যথাক্রমে কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল।

প্রথাগতভাবে ক্রিকেটের মাঠে গ্রুপ ওয়ানের অতিমেধাবী ছেলেদেরকে অন্যেরা সবাই আন্ডারডগ হিসেবেই দেখে। এরা ফার্স্ট রাউন্ড পার হতে পারবে কি না এটা নিয়ে খুব সহজে বাজিও ধরা যায়। কিন্তু আমি যে দলটা পেয়েছিলাম, সেটা কিন্তু এতটা খারাপ ছিলনা। আমাদের বেশ ভাল মানের দুজন ফাস্ট বোলার ছিল (আদনান ও সনেট)। এছাড়া ব্যাটিং-এ অভিজ্ঞতার একটু ঘাটতি থাকলেও বেশ কিছু তাউড়া ব্যাটসম্যান ছিল। আমি নিজে বেশ আশাবাদী ছিলাম আমাদের দল নিয়ে।

নকআউট রাউন্ডে আমাদের প্রতিপক্ষ হল গ্রুপ সিক্স। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রনক ছিল ওদের মূল স্ট্রাইক বোলার। খুব ভাল বোলার, এছাড়া ওরা দল হিসেবেও নিঃসন্দেহে বেশ ভাল ছিল । লো-স্কোরিং এই ম্যাচটা কিছুটা উত্তেজনা ছড়িয়ে ছিল বটে, তবে শেষাবধি জয় নিয়েই আমরা মাঠ ছেড়েছি।

খেলা শেষে খেলোয়াড়রা আমরা নিজেরা নিজেরাই বিজয় উদযাপন করেছি, সাথে ছিল গ্রুপ ওয়ানের হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্র-দর্শক। অন্যান্য গ্রুপের খেলায় যেখানে প্রায় ক্লাসের সবাই চলে আসে খেলা দেখতে, আমাদের গ্রুপ থেকে দর্শক ছিল সে তুলনায় খুবই নগন্য। পরদিন ক্লাসের বন্ধুরা সবাই অবশ্য বেশ প্রশংসা করল আমাদের এবং কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য শুভ কামনাও করল।

০৪

আসলে এতক্ষন ভূমিকাটাই বললাম কেবল। মূল ঘটনার প্রেক্ষাপটটা বোঝানোর জন্যই এত কথা বলা। মূল ঘটনাটা বলি সংক্ষেপে।

কোয়ার্টার ফাইনালে আমাদের প্রতিপক্ষ গ্রুপ সেভেন। খেলার পরদিন আমাদের কুইজ থাকাতে এই ম্যাচেও আমাদের গ্রুপ থেকে দর্শক সংখ্যা ওই পনের-বিশজনের মত। অপরদিকে স্বাভাবিকভাবেই গ্রুপ সেভেনের প্রায় সব ছাত্রই চলে এসেছে খেলা দেখতে। তার উপর গ্রুপ সেভেন হচ্ছে খুবই ভাল দল, ওদের এমন

কয়েকজন ভাল ব্যাটসম্যান আছে, যারা কিনা একাই দলকে জিতিয়ে দিতে সক্ষম।

ওদের ক্যাপ্টেনের নামটা আমি ভুলে গেছি, সম্ভবত সাকিব। আমার টসভাগ্য জায়গামত খুব খারাপ; তাই টসে হেরে গেলাম। সাকিব টসে জিতে ব্যাটিং নিল।

আমাদের বোলারদেরকে সেদিন গ্রুপ সেভেনের ব্যাটসম্যানরা রীতিমত তুলোধুনো করে ছাড়ল। কোন বোলারই রেহাই পায়নি ওদের ব্যাটিং তান্ডব থেকে। বিশ ওভার শেষে ওরা ১৯৯ রানের একটা পাহাড়সম স্কোর দাঁড় করিয়ে ফেলল। খেলা থেকে বলতে গেলে তখনই আমাদের ছুটি হয়ে গেছে, ওভারপ্রতি দশ রানের আস্কিং রেটের কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমরা ব্যাটসম্যানরা বেশ অসুস্থই বোধ করতে লাগলাম।

যাই হোক, ওপেনারদেরকে (ইশতিয়াক ও কিবরিয়া) বললাম, 'আমাদের হারানোর কিছুই নাই রে দোস্ত। শুরু থেকেই চড়াও হয়ে যা বোলারদের উপর, যা খুশী হবে, কুছ পরোয়া নেহি!'

আমাদের শুরুটা খারাপ হয়নি। ওপেনাররা ভালই পিটিয়ে খেলে একটা ভিত গড়ে দিল।

আমি নেমেছি টু-ডাউনে। ওই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আমি ও অন্যান্যরা রানের চাকা কিছুটা সচল রাখতে সক্ষম হয়েছিলাম।

১৪ ওভার শেষে আমাদের স্কোর দাঁড়াল ৪ উইকেটে ১২০ (বা কাছাকাছি)। একদম খারাপ নয়, কিন্তু মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়, কেননা ছয় ওভারে লাগবে আশি রান। আমি নিজে আছি ক্রিজে কিন্তু এই রানের পাহাড় কিভাবে টপকাবোতার উপায় খুঁজে বের করতে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে বারবার।

বিপক্ষ দলের ক্যাপ্টেনই আমাকে উপায় বাতলে দিল। যেটা পরে শুনেছিলাম সেটা বলি, সাকিবের নাকি সেদিন ডেটিং ছিল। খেলার এই পরিস্থিতিতে সে মোটামুটি নিঃসন্দেহ হয়ে গেল যে, তারা ম্যাচটা পকেটে পুরে ফেলেছে, আমাদের জেতার কোনই আশা নেই। তাই সে ভাইস-ক্যাপ্টেন জহিরকে ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব দিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গেল ডেটিংয়ে।

জহির এদিকে করল আরেক কাণ্ড। ক্যাপ্টেন্সি পেয়েই সে সিদ্ধান্ত নিল যে পনেরতম ওভারটা সে নিজেই করবে। জহির হচ্ছে মূলত পার্ট-টাইম অফস্পিনার।

ওর এই অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত দেখে ওদের আরেকজন খেলোয়াড় অর্ণব (অর্ণবের সাথে আমি খেলেছি আগে, আমাকে ভাল মতই চেনে) জহিরকে নিষেধ করল বোলিং করতে, 'অ্যাই জহির, এখন কায়েশ আছে ব্যাটিংয়ে, এখন বোলিং করিস না, দরকার হলে পরে বোলিং করিস!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা? সাকিবের মত জহিরও মোটামুটি সুনিশ্চিত যে, আমাদের হাতে ইতিমধ্যেই ওরা হারিকেন ধরিয়ে দিয়েছে! তাই কারও কথায় পাত্তা না দিয়ে সে আসল বোলিং করতে।

গুনে গুনে চারটা ছয় মেরেছিলাম আমি! সাথে একটা বাউন্ডারী ও আরেকটা দুই রান নিয়ে এই ঐতিহাসিক ওভারটাতে নিয়েছিলাম ত্রিশটি মহামূল্যবান রান।

সাথে সাথে মাঠের পরিবেশটা আমূল বদলে গেল। যদিও তখনো আমাদের পাঁচ ওভারে পঞ্চাশ রান লাগবে, কিন্তু আমাদের জোশ তখন অন্য লেভেলে পৌঁছে গেছে, ওভারপ্রতি দশ রানটাকে খুবই মামুলি মনে হচ্ছিল। আর তার ঠিক বিপরীত অবস্থা আমাদের বিপক্ষ দলে। ওদের তখন পুরা টালমাটাল, এলোমেলো অবস্থা।

আমাদের আরো দুটো উইকেট পড়েছিল, কিন্তু আমাদের যে ব্যাটসম্যানই উইকেটে এসেছে, সেই কিছু না কিছু পিটুনি দিয়ে গেছে জোশের ঠেলায়। আমার মনে আছে, সজল ও আসাদ প্রত্যেকেই দুটা করে বাউন্ডারি মেরেছিল এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাতে।

তিন বল বাকী থাকতে যখন আমি জয়সূচক রানটা নিলাম, স্কোরশীটে আমার নামের পাশে তখন জ্বলজ্বল করছিল নটআউট ৮২!

জয়সূচক রানটা নিয়ে আমি আর থামি নাই, ব্যাটটা মাথার উপর ঘুরাতে ঘুরাতে পাগলের মত দৌড় দিয়েছিলাম আমাদের গ্রুপের দর্শক-খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে। ওরাও বসে ছিলনা, এই অকল্পনীয় জয়ের আনন্দে সবাই আমাকে মাথার উপরে তুলে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিল।

বুঝতেই পারছেন, হেলমেটটা খোলার সময় ও সুযোগ কোনটাই পাই নি আমি!

০৫

আমার জন্য চমক বাকী ছিল আরো।

পরদিন সকালবেলা কুইজ। নন-নটরডেমিয়ানদের জ্ঞাতার্থে বলছি, আমাদের কুইজ হত একদম সকালের শুরুতে (সকাল আটটায়), কিন্তু কুইজটি আমাদের স্ব স্ব ক্লাসরুমে হত না, অন্য একটা রুমে হত। কুইজ শেষে আমরা যে যার ক্লাসে চলে যেতাম দিনের বাকী ক্লাসগুলা করার জন্য।

তো যাই হোক, কুইজ শেষ করেই আমি আর আমার জানের দোস্ত পাঠান তাড়াতাড়ি চলে গেলাম বাইরে। তখনো ক্লাস শুরু হতে সাত-আট মিনিট বাকী। এটা হচ্ছে আমাদের সিগারেট-ব্রেক। চা-সিগারেট শেষ করে দুজনে যখন ক্লাসে ঢুকতে যাচ্ছি, তখন আর এক মিনিট বাকী ক্লাস শুরু হতে। ইতিমধ্যে বাকী সব ছেলেরাই ক্লাসে ঢুকে গেছে।

দরজাটা ঠেলে পাঠান ভিতরে ঢুকল প্রথমে, পাঠানের পিছু পিছু ঢুকলাম আমি।

যে বিশাল একটা সারপ্রাইজ আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না কিছুতেই। আমি ক্লাসে ঢোকামাত্রই ক্লাসের বাকী একশ আটান্নজন ছেলের প্রত্যেকে একসাথে দাঁড়িয়ে গেল এবং সবাই একসাথে হাততালি দিয়ে আমাকে অভিবাদন জানাল!

পুরোপুরি বিহবল হয়ে পড়লাম ঘটনার আকস্মিকতায়, আমার জন্য এটা ছিল অভাবনীয় একটা মুহূর্ত! আমার ক্রিকেটবিমূখ, অতিপড়ুয়া সহপাঠীরা যে এভাবে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে, সেটা ছিল আমার কাছে কল্পনাতীত একটা দৃশ্য!

ভালবাসার এই ঋণ কি কোনভাবে শোধ করা যায়? সেদিন যেভাবে ওরা আমাকে সম্মান ও ভালবাসা প্রদান করেছিল, ঠিক এরকম আর কেউ কখনো পেয়েছে কি না জানিনা, জানতে চাইও না। আমি শুধু জানি, আমি আজীবন গর্ব করে বলতে পারব - আমি সেটা পেয়েছিলাম আমার সহপাঠীদের কাছ থেকে।

তাই তো গলা ফাটিয়ে বলছি, থ্রী চিয়ার্স ফর গ্রুপ ওয়ানহিপ হিপ হুররে!

[উৎসর্গঃ নটরডেম গ্রুপ ওয়ানের প্রাণপ্রিয় সহপাঠীদেরকে কৃতজ্ঞচিত্তে উৎসর্গ করলাম আমার এই গল্পটি।]

সচল নামঃ কাকুল কায়েশ

সচল ঠিকানাঃ

http://www.sachalayatan.com/user/kakul_kayesh

অনেক পরে একদিন

কলেজে থাকতে কী করতাম এখন আর কিছুতেই মনে পরে না। ক্লাস করতাম খুব ভদ্রলোকের মত এতটুকু মনে আছে। নানান জায়গায় কোচিং থাকতো সারাদিন। আরেকটা কাজ করতাম, ফোনে কথা বলতাম অনেক। সারাদিন বন্ধুদের সাথে থেকে বাড়ি ফিরে আবার কেনো ফোন নিয়ে বসতাম সেটা এখন আমার কাছেও বেশ রহস্যময় লাগে। কত গল্প, কিছুতেই শেষ হতোনা।

একদম শুরুর দিকের কথা। কলেজ শুরু করতে না করতেই বিজ্ঞান মেলা। টানা সাতদিন চলবে। আমি নিরামিষ মানুষ। এইসব মেলা টেলা ঠিক পোষায় না। নিঝুম প্রবল উৎসাহে বললো আমাদের নাকি কিছু একটা করতেই হবে। অন্য সব কলেজ আসবে। রীতিমত মানসম্মানের ব্যাপার। আমি ওর উৎসাহে পানি না ঢেলে ঘি ঢাললাম। ও কৃষ্ণগহব্বর নিয়ে একটা প্রজেক্ট শুরু করলো। আগুনে ঘি ঢাললেও ওর পার্টনার হতে রাজি হলাম না। গাছে উঠে মই টান দেয়ার অবস্থা।

মেলা শুরুর দুই একদিন আগের ঘটনা। নিঝুম কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, "আমার কোনো বন্ধু নাই, আমি কি একাই প্রজেক্ট করবো? তুই একটা বেঈমান। তোর উচিৎ আমাকে সাহায্য করা।"

আমি তিতা মুখে অভিযোগ শুনি। বলি, "ঐসব গহব্বর, খালবিল কী জিনিস আমি তো কিছু বুঝি না।"

"বোঝাবুঝির কিছু নাই। সব তো আমিই বলবো, তুই শুধু পাশে থাকবি।"

মেলার দিন বেশ উৎসাহ নিয়ে হাজির হলাম। আমারও প্রজেক্ট আছে। নিঝুম আগে থেকেই সব মডেল নিয়ে তৈরি।

ও সারাজীবন করিৎকর্মা। যাওয়ার সাথে সাথে বলে, "আমি কিন্তু অমুক কমিটি তমুক কমিটির সদস্য, অনেক দায়িত্ব, বুঝলি? সারাক্ষণ থাকতে পারবো না। তুই দেয়ালের লেখা সব পড়ে ফেল। লোকজন আসলে এসব থেকেই ভুজংভাজুং দিয়ে দিবি খুব সহজ ব্যাপার।"

আমার মাথায় তখন কৃষ্ণগহব্বর ভেঙ্গে পড়ার জোগাড়।

...মেয়ে

এই মেয়ে বলে কি!

শেষ পর্যন্ত সাতদিনব্যাপী সেই মেলায় বিখ্যাত বালক কলেজ থেকে আগত ঝাঁক ঝাঁক বালক আর তাদের সায়েন্স ক্লাবের সভাপতিকে ভুজুং দেয়া সহজ না কঠিন আমরা ভালোমতই শিখেছিলাম। না বলে পারছি না যে এরা বিজ্ঞানমেলায় আসার আগে সুগন্ধির বোতল পুরোটা গায়ে ঢেলে আসতো!

বিচারক হিসেবে আসলেন ডঃ মুহাম্মদ জাফর ইকবাল। ঝকঝকে চেহারা, এমন সুন্দর কথা আর বাচনভঙ্গি, আমরা সবাই আনন্দে পাগল হয়ে গেলাম। স্যার আমাদের প্রজেক্ট দেখে বেশ খুশি হলেন। অসংখ্য প্রজেক্টের মাঝে থেকে শেষপর্যন্ত দুজনে একটা পুরস্কার বগলদাবা করে বাড়ী ফিরেছিলাম।

প্রায় নয়বছর পর হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখি জাফর ইকবাল স্যার। মাথাভর্তি কালোচুলে এখন শুভ্রতার ছোঁয়া। আগের সেই হাসি কিন্তু চেহারায় বার্ধক্য।

স্যারকে না, আমি যেন আয়নায় আমাকে দেখলাম। সেই তীব্র উচ্ছ্বাসে ভরা কিশোরী কোথায় গেলো? কখন এত সময় চলে গেলো? পিছনে ফিরলে ভিকারুন্নিসা এখন অনেকটাই ঝাপসা।

সচল নামঃ মেয়ে
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/guest_writer

বন্ধুরা এলোমেলো

...পান্থ রহমান রেজা

সম্পর্কগুলো কীভাবে ভাঙ্গে? কিংবা কেনইবা দূরত্ব তৈরি হয়? ঝগড়া অথবা অভিমানে? ছোট ছোট অভিমান, ছোট ছোট কিছু অবহেলায় হয়তো একদিন মুখ ফিরিয়ে নিই প্রিয় হয়ে ওঠা কোনো বন্ধুর দিক থেকে! এসবই সত্য। তবে সবচেয়ে বড়ো নির্মম সত্য সময় ।

সময়ই দূরত্ব তৈরি করে দেয়। শুধু মগজের স্মৃতিকোষে ছাপ রেখে যায় একটা। একদিন হয়তো বিষণ্ন বিকেলে হুড়মুড় করে নেমে আসে। নস্টালজিক করে তোলে। ভেবে কাতর হই। অনেক আকুলতা নিয়ে বলতে ইচ্ছে করে- কেমন আছো প্রিয় বন্ধু লিপি?

মেয়ে তুমি এখনো আমায় বন্ধু ভাবো কি?

কখনো কি আমায় ভেবেছিলে বন্ধুর চেয়ে একটুখানি বেশি...

লিপি আমার কলেজবন্ধু। বন্ধুর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না অবশ্য। যদিও সেটা হলেও হতে পারতো। আমার দিক কোনো বাধা ছিল না। লিপির হয়তো ছিল। তাই হয়ে ওঠে নি।

তবে লিপির সাথে কোনো অভিমান হয়নি, কখনো ঝগড়াও না। কিন্তু ধীরে ধীরে দূরত্ব বেড়ে গিয়ে ধূলো জমেছে। একটা সময়ে ভুলে গেছি ওর কথা। সময়ই দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছে আমাদের মাঝে। হায় সময়!

পরে একদিন শুনেছি লিপি বিয়ে করেছে। আরো পরে শুনেছি ঢাকায় সংসার পাতার কথা। একদিন হাফিজা বলে, "লিপির দুই বাচ্চা হয়েছে। চলো, একদিন ওর বাসা থেকে ঘুরে আসি।"

যাবো যাবো করে আর যাওয়া হয়নি।

আমাদের কলেজে আরেক লিপি ছিল। মোটকু লিপি। কলেজ ছাড়ার পর আর একদিনের জন্যও দেখা হয়নি। শুধু শুনেছি আমার আরেক কলেজবন্ধু খোকনের এক ভাইকে বিয়ে করেছে ও। শেষ খবর এটাই পাওয়া। তারপর আর কোনো খবর নেই মোটকু লিপির। কেমন আছে, কয়টা বাচ্চাকাচ্চার মা ও এখন। জানতে ইচ্ছে করলেও জানা হবে না তা।

এই-ই হয়তো আমাদের জীবনের চরম সত্য।

কলেজে খোকনও ছিল আরেক ক্লোজ বন্ধু। আমি ঢাবিতে ভর্তি হই। আর ও ভর্তি হয় ঢাকা কলেজে। স্থানিক দূরত্ব কম হলেও সম্পর্কের দূরত্ব বেড়ে গেছে দিন দিন। একদিন চায়ের তৃষ্ণায় অফিসের নিচে নামলে দেখা হয়ে যায় খোকনের সাথে। কতদিন পর কত কথা হয় চায়ে চুমুক দেয়ার ফাঁকে!

এর অনেক পরে একদিন মিরপুরে দেখা হয়। বিয়ে নয়, খবর দেয় সন্তানের বাবা হওয়ার। সন্তানের বাপ হওয়ার পর আর দেখা হয়নি কারো কাছ থেকে ওর আর কোনো খবরও পাইনি।

আচ্ছা, মোহাম্মদ কেমন আছে? ওর সাথে আমার অতটা খাতির ছিল না কখনোই। তবে ও ছিল খোকনের জানি দোস্ত। সেই সূত্রে যা কিছুটা মাখামাখি। বছর তিনেক আগে সাভারের জিরাবোতে বন্ধু রাজিবের বাসায় গেলে দেখি মোহাম্মদকে। একটা গার্মেন্টসে আছে। মার্চেন্ডাইজার। পাশাপাশি একটা ব্যবসা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। ব্যবসা কি দাঁড়িয়েছে? কে জানে!

কয়েকদিন আগে বাড়ি যাবো। জরুরি একটা দরকারে। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। একজন এসে বললো, "আপনাকে চেনা চেনা লাগছে।"

ঘাড় বাঁকিয়ে ভ্রু কুচকে তাকাই। আরে ফরিদ!

ফরিদের সাথে পড়াশোনা নিয়ে রেশারেশির কম্পিটিশন ছিল। তবে সেই রেশারেশি কখনো বন্ধুত্বের মাঝে বৈরী হয়ে দাঁড়ায়নি।

আরেকজনের সাথে পড়াশোনা নিয়ে তুমুল কম্পিটিশন ছিল। সে দীপু। একটু বেশি পারে, পড়াশোনা নিয়ে এই ভাব ছিল তার মধ্যে প্রবল। আমরা দুজনেই ঢাবিতে চান্স পাই। ও নেয় অ্যাকাউন্টিং আর আমি ফিন্যান্স। ফলে কম্পিটিশনে ছেদ পড়ে। তবে বন্ধুত্ব ঠিকই ছিল।

ভার্সিটি ছাড়ার পরে, সেটা ফিকে হয়ে আসে। এখন কালেভদ্রেও কথা হয় না। হয়তো সিএ ফার্মের হিসেব-কিতাবে দীপু সারাক্ষণ ব্যস্ত এখন।

ঘটনাটা একদিন বাসে করে বাড়ি যাওয়ার পথে। আমার পেছনের সিটে বসা তরুণীটিকে চেনা চেনা লাগছে। একটা পিচ্চিকে কোলে নিয়ে বসে আছে। জানালা দিয়ে বাতাস এসে চুল উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাশে স্বামীপ্রবর। মেয়েটিকে দেখতে ঠিক নার্গিসের মতো লাগে। কিন্তু বলবো বলবো করেও বলা হয়ে উঠেনি- তুমি কি বেলকুচি কলেজের ৯৭-৯৮ ব্যাচের নার্গিস?

কত খুনসুটির স্মৃতি যে জমে আছে নার্গিসের সাথে!

হাফিজার কথা আগেই বলেছি। বেলকুচি কলেজের বন্ধুদের মধ্যে ওর সাথেই এখন বেশি যোগাযোগ। সেটা হয়তো ভার্সিটিতে একসাথে পড়ার কারণে। অথবা জানি দোস্ত রাসেলকে বিয়ে করার কারণে। কয়েকদিন আগে ওর মিসকারেজ হয়েছে। বাসায় গেলে দেখি খুবই মনখারাপ করে বসে আছে। প্রিয়বন্ধুকে কী বলে সান্ত্বনা দিই, সেটা ভাবতে গিয়ে দেখি বলবার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি।

হাফিজার ভাগ্নি ঝর্ণা। সেও আমাদের সাথে কলেজে পড়তো। ও কবিতা লিখতো। সিরাজগঞ্জের সাপ্তাহিক যমুনাবার্তা, সুন্দরবার্তায় সেগুলো ছাপা হতো। সেসব নিয়ে কলেজ করিডোরে কত কথা হতো। কত বইপত্র দেয়া-নেয়া হতো। ঝর্ণা হোম ইকোনমিক্সে ভর্তি হলেও কেনো জানি যোগাযোগ কমে যায়। তারপর এই সেদিন রাসেল-হাফিজার বাসায় দেখা। বলে, 'তোমার গল্পের বইটা পড়েছি।'

ওর সাথে অনেকদিন পর দেখা হলে অনেক ভালো লাগে।

তামাই যুক্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তামাই বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, বেলকুচি কলেজ আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি- এসব প্রতিষ্ঠানে আমি আর শুভেচ্ছা একই সাথে পড়েছি। কিন্তু যেদিন ভার্সিটি থেকে বের হয়ে গেছি, যার যার কর্মক্ষেত্রে ঢুকেছি, তারপর থেকে যোগাযোগ অনেক কমে গেছে। এখন ওর সংসার হয়েছে। কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। সময় এসে শ্যাওলা ফেলে দিয়ে গেছে বন্ধুত্বের মাঝে।

শুভেচ্ছার মতো রাজ্জাকের সাথেও একই অবস্থা আজ। আমাদের স্কুল কলেজ একই ছিল। তবে ভার্সিটি ভিন্ন। ও চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। গত মার্চ মাসেই বিয়ে করেছে। কুড়িগ্রামে। বিয়ের দাওয়াতে যাওয়ার জন্য কত তাড়া। যাই নি। বিয়ের পরে একদিন ফোন দিই নতুন সংসারের খবর নিতে। ফোনটা ধরে নি সে। এভাবেই একদিন হয়তো স্মৃতিতে ধূলো পড়বে।

জুবাইদার সাথে কলেজে খাতির জমেনি কখনো। হাই-হ্যালো হতো। ভার্সিটি এসে হয়তো সেই বন্ধুত্বটা তৈরি হতে পারতো। কিন্তু কেন জানি হয়ে ওঠে নি একবারের জন্যও রোকেয়া হলে গিয়ে কাগজের স্লিপে জুবাইদার নাম লেখা হয়নি।

একদিন আমার সিনিয়র কলিগ আলীম ভাইয়ের সাথে এটা-সেটা কথায় শুনি জুবাইদা উনার শ্যালিকা। বিয়ে করেছে এক সরকারি কর্মকর্তাকে। সংসার নিয়ে ভালোই আছে। সংসার নিয়ে ভালো আছে জেনে আনন্দিত হই।

এই লেখা যখন লিখছি তখন অনেকের মুখ ছবি হয়ে মনে ভাসছে, কিন্তু কারো নামই মনে করতে পারছি না। তবে স্মৃতি কোষকে খানিকটা জাগিয়ে দিলো রিপন, ফোন দিয়ে তালেবের কথা মনে করিয়ে দিয়ে। কলেজের বন্ধুদের মধ্যে রিপনের সাথেই এখন বেশি যোগাযোগ হয়। তাও ফোনে।

এর পিছনের কৃতিত্বটা আমার নয়। রিপনেরই। ও-ই ফোন করে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটে যাওয়া ছোট-খাট অনেক কিছুই ও শেয়ার করে। এই শেয়ারিং কতদিন থাকবে কে জানে! যেমন নেই হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া জয়নাল, বাতেন, হাসান, মুকুল, সামছুল, তমাল, রেজা, আলমগীর, নাজমা, বুলবুল, সোমা, বীথির মতো মুখেরা। ওরা আজ কোথায় আছে কে জানে!

সচল নামঃ পান্থ রহমান রেজা

সচল ঠিকানাঃ

http://www.sachalayatan.com/user/pantha_rahman_reza

"...তুমি আমাকে চিনতে পারছো কি? সেই যে নবীন বরণের অনুষ্ঠানে স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বলো তো, আমার শার্টের রঙ কি ছিলো? বলতে পারলে না তো! নীল। নীল রঙটা আমার খুব পছন্দের। হয়তো কষ্টের রঙ নীল আর আমি নীলের সংজ্ঞাটাই পালটে দিতে চাই বলেই। আচ্ছা, তোমার পছন্দের রঙ কি? সাদা হয়তো। সেদিন সেই শুভ্রতায় মোড়া তোমাকে অনন্য লাগছিলো। ঠিক যেন জীবনানন্দের কবিতার সেই ধবল বকটি! আচ্ছা, বক বলায় আবার রাগ করলে না তো? তুমি কি কবিতা পছন্দ করো? নাকি, কবি আর কবিতা তোমার দু'চোখের বিষ?

থাক, প্রথম চিঠিতেই এত প্রশ্ন করে তোমাকে ভড়কে দিতে চাই না। তোমার রেসপন্স পেলে তখন আরো জানা হবে দু'জনার।

রেসপন্সই বা পাবো কিভাবে? তুমি তো আমার ঠিকানাই জানো না। নাইবা জানলে! রেসপন্স পজেটিভ হলে সেই সাদা ড্রেসটা পরে আবার কলেজে এসো। আমিই তোমাকে খুঁজে নেবো।"

তখনো মোবাইল ফোন আসে নি, আসেনি ইন্টারনেট। নায়ক-নায়িকার ছবির জন্য সম্বল ভিউকার্ড আর পর্ণের জন্য রসময়।

প্রেমের জন্য চিঠির বাজার রমরমা, হয়তো নিভে যাওয়ার আগে শেষবার দপ করে জ্বলে ওঠা। নাহলে আমিই বা কেন অন্তরাকে এক মাসে ১৯ খানা প্রেমপত্র লিখতে যাবো! ভুল বললাম, ১৯ খানা তো শুধু তাকে পোস্ট করা হয়েছিলো, লেখার সংখ্যা হয়তো কয়েক শ'ই হবে!

আর কবিতাগুলো? গ্যালিলিও হয়ে চাঁদ-তারাকে ধুলার পৃথিবীতে নামিয়েছি, বিরহে কাতর হয়ে রাত্রির সাথে মিশে লিওপার্ডি হয়েছি। স্বপ্নের হাত ধরে গিয়েছি কাঞ্চনজঙ্ঘায়! কী ছিলো না সেইসব কবিতায়!

তবে এই গল্পে সেইসব কবিতার কথা আসবে না। কারণ, গল্পটা আমার প্রেমের পত্র নিয়ে নয়। গল্পের প্রেমপত্র লেখা নায়কটি কে হতে পারে, সেটা নিয়ে গবেষণার আগেই আমরা অবশ্য ধরে ফেলি ডালের ভিতরে কালা কোনো তেলাপোকা নিশ্চয়ই আছে, নাইলে এত সুন্দর একটা খামে নিজের হাতে নকশা এঁকে আমাদেরই ক্লাসমেট নদীর নামে গোটা গোটা হরফে ঠিকানা লেখা প্রেরকের উদ্দেশ্যবিহীন এই চিঠিটা কেইবা খামোখা পাঠাতে যাবে?

ঘটনার কালের আঁচ পাঠক হয়তো ইতোমধ্যে পেয়েছেন, তবে স্থান সম্পর্কে বেশি কিছু বলা হবে না, ধরে নিন এটা কোনো মফস্বলের কলেজের ঘটনা, যেখানে সহশিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো ক্যাচাল নেই, পড়াশোনার চাপ ছাপিয়ে প্রেম করার মতো সময় অফুরন্ত এবং কলেজের পাশেই একটা পোস্টাফিস আছে, যার মামারা সঠিক প্রাপকের হাতে চিঠি পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে একটু শিথিল; বরং এর হাতে ওর পত্র পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বার্পণই তাদের কাছে দায়িত্ব পালনের নামান্তর।

আমরা কেউ পোস্টাফিসে গেলেই মামারা পুরা চিঠির বান্ডিল আমাদের হাতে ছেড়ে দিতেন, আমরা বেছে বেছে নিজেদের চিঠি, সাথে বন্ধুদের চিঠিও নিয়ে আসতাম।

আমরা' বলতে আমি এবং আমার কয়েকটা দোস্ত, যারা বেসিক্যালি খারাপ ছেলে না, তবে পুংটামির সুযোগ পেলে ছাড়ে না আর কি।

নদী আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে হট মেয়ে এ কথা বলা যাবে না। তার চেহারা আমার কাছে বরং কিছুটা ইঁদুরমুখো মনে হয়। তবে শুরু থেকেই দেখেছি আমাদের দুই ইয়াং টিচার নদীর কখন, কী লাগে, সে ব্যাপারে পারলে জীবনোৎসর্গ করে দেয়। বড় ভাইদের মধ্যেও নদীকে নিয়ে কানাঘুষা বেশি। আর সেইসাথে যোগ হলো এই প্রেমপত্র।

পত্রটি যে-ই লিখুক, আমরা সেটি কোনোরকম অনুশোচনার সম্ভাবনা ছাড়াই বাজেয়াপ্ত করলাম। এখন খুঁজে বের করতে হবে কে সেই জীবনানন্দের কবিতা পড়া চান্দু।

এই খুঁজে বের করাটা কঠিন হবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তা ছিলো জলবত

তরলং। টিচারগুলা প্রেমপত্রের ঝুঁকি নেবে না, তারা বাদ। ক্লাসমেট হলে চিঠির বদলে আগে নোট চালাচালি কিংবা গ্রুপ ফাইটের ধান্দা করবে আর একই ক্লাসে থাকায় এরকম কোনো মজনু আমাদের চোখ এড়াতে পারবে না।

সুতরাং সন্দেহটা বড় ভাইদের ওপরে গিয়েই পড়লো। আমরা বরং নদীর ওপর নজর রাখলাম এবং কয়েকদিনেই স্পষ্ট হলো নদীর দিকে প্রত্যাশার চোখে তাকানো মালটি সেকেন্ড ইয়ারের লেনিন ভাই।

নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাকে গিয়ে ধরলাম, "ভাইয়া, পড়াশুনা নিয়া ব্যাপক ঝামেলায় আছি, ক্যামনে কি কিছুই বুঝতেছি না, আপনি শুনলাম খুব ভালো নোট করেন।"

তিনি টোপ গিললেন। প্রেমিকার বাড়ির কুত্তারও নাকি অন্যরকম আদর। আর আমরা তার সম্ভাব্য প্রেমিকার ক্লাসমেট। আমাদেরকে খেপানোর চেয়ে হাত করার এই সুযোগ তিনি ছাড়বেন কেন!

নোটের হাতের লেখা আর প্রেমপত্রের লেখা মিলিয়ে আমরা মুচকি হাসি দিলাম। অবশ্য তার জন্য কিছুটা খারাপও লাগলো। লোকটা দেখতে লালটু আছে, একটু চিকনা হলেও লম্বা, ভালো স্টুডেন্ট বলেও সুনাম। এই লোক নদীর মতো ইঁদুরমুখীর জন্য পাগোল হলো নিউটনের কোন ফর্মূলায়, কে জানে! অবশ্য প্রেম তো আর নিউটনকে চেনে না, তার পীরিতি ফ্রয়েডের সাথে।

এর মধ্যে আমরা কেউ না কেউ প্রতিদিন সকালেই পোস্টাফিসে গিয়ে ফলোআপ চিঠি খুঁজতাম, এ অভিযানে কোনো ছিদ্র রাখা যাবে না। সপ্তাহখানেক পরে আবার সেই চিঠি, সেই একই খাম, একই হাতে ঠিকানা লেখা, যদিও খামে নকশার পরিমাণটা কম। কম লেখার পরিমাণও,

"প্রিয় নদী,

তোমাকে কিছুদিন আগে একটি চিঠি দিয়েছিলাম। কোনো রেসপন্স পেলাম না। চিঠিটি পেয়েছ কিনা জানি না। এ চিঠি তোমার হাতে পেলে একটিবারের জন্য তোমার সাদা ড্রেসটি পরে কলেজে এসো। আমিই তোমার সাথে কথা বলবো।"

স্পষ্টতই নদী আর তার বিশেষ অকেশানের জন্য তুলে রাখা সাদা ড্রেসটি পরে না, লেনিন ভাইও দিনে দিনে আরো অস্থির হন, নদীর সাথে কথা বলার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেন না। আমরা তার সেই অসহায় অবস্থা দেখে কিছুটা মর্মযাতনা ফিল করলেও আসল ঘটনা ফাঁসের দিকে যাই না। এটা ওয়ানওয়ে ট্রাফিক, আর ফেরার কোনো পথ নেই। ভালো ছেলে হিসেবে আমাদের যে সুনাম আছে, এই ঘটনা ফাস হলে তা পুরা তামা হয়ে যাবে।

পরের সপ্তাহে তৃতীয় চিঠিটি পাই। একই খাম, তবে এবারে আর খামের ওপর নকশা নেই। চিঠি খুলে পড়ি,

"...শুনেছিলাম সুন্দর মুখের মেয়েরা নিষ্ঠুর হয়। কখনো বিশ্বাস করি নি, আজ তোমাকে দেখে বুঝলাম। তোমার মুখের হাসি আজ বিশ্বাসঘাতক, তোমার চোখের চাহনীকে ভেবেছিলাম আহবান, অথচ তা ছিলো তীব্র ভ্রুকুটি! কিসের এত অহঙ্কার তোমার?

আমার সাথে কথা বলতে চাও না সরাসরি বললেই পারতে। কী হতো একটিবার সেই সাদা ড্রেসটি পরে সামনে এসে দাঁড়ালে? অথচ এমন ভাব করলে যেন কিছুই হয় নি। আকাশের তারারা খসে যায়, উলকারা হারিয়ে যায়, কেউ যেমন তাদের কথা মনে রাখে না, ঠিক তেমনি অবজ্ঞায় তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো আমার নির্দোষ চিঠিগুলোকে।

তোমার থেকে রেসপন্স না পেলে মনে রেখো এটাই আমার শেষ চিঠি।"

এই চিঠিটি পড়ে আসলে আমাদেরও বুকটা মোঁচড় দিয়ে ওঠে। তখনো কঁচি বয়স আর নিজেরাও অল্পস্বল্প জেনুইন প্রেমের ধান্দা করছি, উপেক্ষার কষ্টটা বুঝি। একবার ভাবি, যাই সব কিছু বলে দেই, চিঠিগুলো দিয়ে দেই নদীকে।

কিন্তু সাহসে কুলোয় না। তাছাড়া অন্যের কষ্টে মানুষ আসলে কোনো কষ্টবোধ করে না, যদিনা কষ্টগুলো তার নিজের জীবনের সাথেও মেলে। আমাদের কষ্টটা ছিলো নিজেদের জীবনে মেলানোর জন্যই, লেনিন ভাই সেখানে তুচ্ছ, নদীও তুচ্ছ, তাদের কষ্টে আমাদের আসলে কিছুই যায় আসে না।

এই দার্শনিকতা অবশ্য বর্তমানের সংযোজন, দেড়যুগ আগের সেই যাপিতজীবনে এত দর্শনের সময় ছিলো না। লেনিন ভাইয়ের নীল রঙের সংজ্ঞা পালটে দেয়ার স্বপ্নে আমরাও আর কোনো পজিটিভ ভূমিকা রাখতে পারি নি।

সচল নামঃ অদ্ভুৎ বলাই
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/bolai

রাজনীতিঃ

"এই শোন, তোরা সব ছাত্রলীগ।"

ঠিক আছে, তাই সই। কায়কোবাদ ভাই যখন বলেছেন তখন আমরা সবাই ছাত্রলীগ। উনি আমাদের স্কুলের বড়ভাই, ঢাকা কলেজের ছাত্রনেতা।

আমরা সবাই গভঃ ল্যাবরেটরি স্কুল থেকে পাস করে ভর্তি হয়েছি ঢাকা কলেজে। আমাদের স্কুলটা এই কলেজের একদম পাশেই, ছোট রাস্তাটা পার হলেই হল। আমাদের সময় ল্যাবরেটরি স্কুলের ছাত্রদের জীবনের অনেক লক্ষ্যের মধ্যে একটা ছিল ঢাকা কলেজে ভর্তি হওয়া। আমার বাবাসহ আর যাবতীয় পুরুষ আত্মীয় এই কলেজে পড়েছেন, মোটামুটি নিশ্চিত ছিল যে এইখানেই ভর্তি হব।

তাছাড়াও নটরডেম কলেজে চান্স পাইনি, ভর্তি পরীক্ষায় টোকাটুকি করতে গিয়ে ল্যাজে গোবরে করে ফেলেছিলাম। আমাদের স্কুলের চুরাশি জনের মধ্যে মোটামুটি ষাট-পয়ষট্টি জন ভর্তি হয়েছে ঢাকা কলেজে। বাদবাকিদের কয়েকজন নটরডেম কলেজের চাপ সহ্য করতে না পেরে দুই মাসের মধ্যেই বিভিন্ন পন্থায় চলে এসেছে ঢাকা কলেজে। সুতরাং আমরা বিরাট একটা দল স্কুল থেকে কলেজে ঢুকেছি।

সময়টা ১৯৮৬ সাল, এরশাদের আমল। মাঝে মাঝেই উত্তাল দেশ। ঢাকা কলেজে ঢুকলেই দেশের রাজনীতির একটা চিত্র পাওয়া যায়। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্যারের রুম পেরিয়ে একটু এগুলেই শ্লোগান মুখর দেওয়াল তাতে লেখা শিক্ষা সুযোগ নয় অধিকার, আরেকটু গেলেই দোতলায় উঠার সিঁড়ি, ডানে ও বাঁয়ে গ্যালারিগুলোতে যাওয়ার পথ। সবগুলো দেওয়ালেরই বলার মত অনেক কথা আছে। কেউ শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়ার অনুসারী, কেউ বা বলেছে ভিয়েতনাম জিতেছে ভিয়েতনামরা জিতবে। আরেকটা দেওয়ালে লেখা অধিকার কেউ কাউকে করে দেয় না অধিকার আদায় করে নিতে হয়, ঢাকা কলেজের দেওয়ালগুলো কি দারুণ জীবন্ত!

এই দেওয়ালগুলোতে ছাত্র শিবিরের কোন স্থান নেই, পুরো কলেজ খুঁজলেও কোন প্রকাশ্য শিবির কর্মী পাওয়া যাবে না। রাজনীতির সমীকরণে তখনো ছাত্রদল আর ছাত্র শিবিরের এত প্রেম হয়নি, রাজাকারদের ছাত্রদলের ছেলেরাও তফাতে রাখে।

আমরা রাজনীতির মারপ্যাঁচ বেশি বুঝি না তবে বুঝি এরশাদকে হটানো দরকার। আর এইজন্য হাসিনা আর খালেদাকে এক মঞ্চে আসতে হবে, এইটুকুই শুধু বুঝতে পারি। কায়কোবাদ ভাইয়ের কথায় আমরা প্রায় সবাই ছাত্রলীগে ঢুকি, আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুধু সকালে একটা মিছিল করা, তাও খুব বেশি দিন করিনি। আমাদের একজন বন্ধু বেশ সিরিয়াসলি রাজনীতি করতে থাকে, পরবর্তীতে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাও হয়েছিল। আমাদের সব রাজনীতি দুই মাস মিছিল করেই খতম।

ঢাকা কলেজে একজন সিনিয়র বামপন্থী ছাত্রনেতা ছিলেন, সম্ভবত ছাত্র ইউনিয়নের, উনাকে সবাই গোবিন্দ'দা বলে ডাকত। আমরা যখন স্কুলে এইট-নাইনের ছাত্র তখন থেকেই গোবিন্দ'দা আমাদের স্কুলে আসতেন, আমাদেরকে সমাজতন্ত্রের দীক্ষা দিতেন। আমরা দীক্ষার চেয়ে উনাকে ছিল মেরে ঝালমুড়ি, চটপটি আর আইসক্রিম খেতেই বেশি ভালো বাসতাম। উনার বর্ষব্যাপী এত চেষ্টার পরও কায়কোবাদ ভাই মোটামুটি এক কথায় আমাদের ছাত্রলীগে ঢুকিয়ে দেন।

মনে আছে ঢাকা কলেজে গোবিন্দ'দাকে দেখলে আমার একটু অপরাধবোধ হত যদিও উনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন আমাদের বেঈমানীতে। পাশ করে যাওয়ার পরেও অনেকবার দেখা হয়েছে, প্রতিবারই উনি চিনেছেন এবং কথাবার্তা বলেছেন সাধারণ ভাবেই। পরবর্তীতে আমি এবং আমার বন্ধুরা সবাই বুর্জোয়া জীবন বেছে নিয়েছি, সমাজতন্ত্রও পরাজিত হয়েছে ধনতন্ত্রের কাছে কিন্তু তাও একটা আদর্শের পেছনে গোবিন্দদার নির্মোহভাবে একটা জীবন ব্যায়ের সংকল্পটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে যায়।

আড্ডাবাজিঃ

ঢাকা কলেজে পড়লে পড়াশুনার আগে আড্ডাবাজির কথাই চলে আসে। আমরা কলেজ ছেড়ে আসার কয়েক বছর পর ক্যান্টিন আর কমনরুমকে সরিয়ে নেয়া হয় মূল ভবনের বাইরে দক্ষিণের পুকুরের পাড় ঘেঁষে। আমাদের সময় ক্যান্টিন ও

কমনরুম দুটোই ছিল কলেজের উত্তর দিকের মূল ভবনের ভেতরেই। একতলায় ক্যান্টিন আর তার উপরে দোতলায় কমন রুম। কমনরুমের পাশে ছোট একটা বারান্দা সেখান থেকে আমাদের স্কুল আর কলেজের মাঝের রাস্তাটা দেখা যায়।

আমি স্কুলে পড়ার সময় ভাবতাম কলেজে উঠে স্কুলের টেরর স্যারদের গালাগাল করব ওখান থেকে, উনারা ওই পথেই আসা যাওয়া করতেন। স্কুল ছেড়ে যাওয়ার পরে আর সেই বাসনা কখনই হয় নি বরং ভয় ভুলে আস্তে আস্তে শ্রদ্ধা করা শুরু করেছি তাঁদের।

কমনরুমের ভেতর টেবিল টেনিস, ক্যারাম আর দাবা খেলার সুব্যবস্থা। মিঠু নামে আমাদের দুই টেবিল টেনিসপ্রেমী বন্ধু ছিল, এদের খুঁজতে হলে অন্য কোথাও না গিয়ে এখানে আসলেই পাওয়া যেত। কমনরুম থেকে বেরুলে একটা বিশাল খোলা ছাদ পড়ত সেটা পেরিয়ে আবার ক্লাসে আসা যেত। কলেজে আমার সবচেয়ে বেশি সময় কেটেছে কমনরুম আর এই ছাদে। ছাদ ছাড়াও বলাকা সিনেমা হলে দল বেঁধে সিনেমা দেখতে যাওয়া আর নিউমার্কেট ভ্রমণ ছিল মোটামুটি নিয়মিত।

একবার সিনেমা দেখতে গিয়ে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ শুরু হয় এবং তার জের ধরে পুলিশ কলেজের ক্লাসের ভেতর ঢুকে ছাত্রদের বেদম প্রহার করে। ঠিক সময় দৌড় দেওয়াতে অক্ষত ছিলাম। আমার বন্ধু দীপু একটু মোটাসোটা থাকায় দৌড়াতে না পেরে পুলিশের বেদম প্রহারের শিকার হয়। মার খেয়ে বাসায় কাউকে কিছু বলেনি, কিন্তু পরদিন সকালে পেপার খুলে দীপুর বাবা প্রথম পাতাতেই দীপুর ছবি দেখতে পান, পুলিশ তার ছেলের চুলের মুঠি ধরে আছে। দীপুটা মারা গেছে অনেকদিন হয়ে গেল, ভালো মানুষ একটা বালককে চোখ বুজলে আজো দেখতে পাই। আহ্ শান্তি পাক ওর আত্মা।

ঢাকা কলেজে পড়াকালীন সময় সিগারেট খাওয়া নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়। আমরা খেতাম বাংলাদেশে তৈরি ৫৫৫ সিগারেট, যেটাকে সবাই বাংলা ফাইভ বলত। সিগারেটের প্রতি শলাকার দাম ছিল আড়াই টাকা, ১৯৮৬ সাল মনে হয় তরুন ধূমপায়ীদের জন্য খুব খারাপ বছর। একটা কিনে জয় মা স্টাইলে ভাগ করে খাওয়া চলত। এছাড়া কাছেই গোল্ডেন গেইট হোটেলের বার, ওটার এক মালিকের ছেলে আমাদের বাল্যবন্ধু ছিল। কয়েকবার যাওয়া হয়েছে, কিন্তু পকেটের যা অবস্থা ছিল তাতে বিশেষ কোন নেশা করা যায়নি কখনো।

'৮৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের সম্পর্ক বেশ ভালোই ছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা এরশাদের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহনের ঘোষণা দেওয়ার পর হঠাৎ করেই একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠে পরিস্থিতি। মিছিলগুলোতে থেকে একে অপরের প্রতি উস্কানীমূলক কথা আসতে লাগল। একটা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেগে গেল মারামারি, ফলাফল ছাত্রলীগ কর্মীরা আর ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারে না। আমি যেহেতু সক্রিয় কেউ না, আমি যাওয়া আসা করি নিরুপদ্রুপেই, কিন্তু থমথমে একটা ভাব পুরো কলেজ জুড়েই।

ঢাকা কলেজের আসে পাশের জায়গাগুলোতে আওয়ামী লীগ ব্যাপক শক্তিশালী তারপরও ছাত্রদের মধ্যে ছাত্রদলের জনসমর্থন বিপুল। কয়েকদিন পরে নেতারা একটা আপোষরফায় আসলে আবারো শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু ১৯৮৬ এর নির্বাচনে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগের বিরাট রাজনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল, মোটামুটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছিল সেটা।

খেলাধূলাঃ

ঢাকা কলেজের পেছনে বিরাট একটা ফুটবল খেলার মাঠ। সেখানে স্কুলে থাকতেও খেলেছি। কিন্তু কলেজে উঠে সেখানে ফুটবল খেলেছি মাত্র দুই একবার। আমি ভালো কোন খেলোয়াড় নই, আমার স্টার প্লেয়ারদের খেলায় চান্স পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আমাদের জন্য খেলা ছিল কলেজের সামনের টেনিস এবং বাস্কেটবল কোর্টে টেনিস বল দিয়ে ক্রিকেট খেলা, খুব বেশি ফিট হওয়ার দরকার নেই, শুধু ব্যাট ধরে হাঁটাহাঁটি করতে পারলেই হল।

খেলার শেষে আড্ডা চলত আর চলত তিন তাস এবং নয় তাসের জুয়া খেলা। জুয়াতে আমার ভাগ্য খুবই খারাপ মোটামুটি বাস ভাড়াটা ছাড়া আর সব কিছুই চলে যেত মাঝে মাঝে পরবর্তীতে সেই জুয়ার আসর আমার নিজের বাসায় বসা শুরু করল কেউ কেউ আমাদের বাসার নাম দিয়ে দিলো ক্যাসিনো দ্য তেজগাঁ। সেই ক্যাসিনোর অনেক জুয়াড়ি এখন জীবনের জুয়ায় ব্যস্ত, অনেকেই ভালো জিতেছেন, কেউ কেউ আবার আমার মত শুধু মূলধনটা সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছেন।

পড়াশুনাঃ

ঢাকা কলেজে মনে হয় সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল লেখাপড়া করা। কিছু ভয়াবহ স্যারের ক্লাস (যেমন কেমিস্ট্রির সিদ্দিকুর রহমান, ফিজিক্সের নুরুন্নবী তালুকদার, স্ট্যাটিস্টিক্সের খিজির হায়াত) আর অল্প কিছু ল্যাব করা ছাড়া আমাদের ক্লাসে বেশি যাওয়া হত না। সাইন্সের বেশির ভাগ ক্লাসই হত গ্যালারিতে, মনে হয় ছয়টা গ্যালারি ছিল। গ্যালারিগুলো প্রকান্ড ক্লাসরুম, স্টেডিয়াম সিটিং, মাথার উপর ঘুরছে একাধিক ফ্যান, ক্লাসের ভেতরেও গল্পগুজব খুব আরামেই চালানো যেত।

আমাদের আগের বছর পর্যন্ত কলেজের ট্র্যাডিশন ছিল ছেলেরা বিনা পরীক্ষায় ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে উঠে যাবে। মগের মুল্লুক মনে হয় একেই বলে।

আমাদের প্রিন্সিপ্যাল স্যার (নাম মনে পড়ছে না) সেবারই প্রথম বাধ্য করলেন আমাদের পরীক্ষা দিতে, ফলশ্রুতিতে অনেকেই ধূলোটূলো ঝেড়ে বই পত্র নিয়ে বসল। যেমন প্রস্তুতি ঠিক সেই রকম ফলাফল, আমি সহ আমার চেনাজানা বন্ধুরা সবাই অতিকষ্টে সেকেন্ড ইয়ারে উত্তীর্ণ হলাম। তবে একটা ভালো ব্যাপার যে আমরা অনেকেই বুঝতে পারলাম যে পড়াশুনারও দরকার আছে।

ঢাকা কলেজের যেকোন ক্লাসে ঢুকলে মনে হবে দেশে কলেজ শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। ক্লাসগুলো মোটামুটি ফাঁকাই থাকত। তবে একজন ছিলেন ব্যতিক্রম। উনি হচ্ছেন বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র খ্যাত বাংলার অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সূত্রে উনাকে চিনতাম, টিভিতেও দারুণ মজার সব ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান করে উনি তখনই সেলেব্রেটির স্তরে পৌঁছে গেছেন। উনার ক্লাসগুলো প্রায় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মতই উপাদেয়। ক্লাসে ঢুকে উনি সবাইকে জানালেন যে ক্লাসে পড়িয়েছেন এই বদনাম উনাকে কেউ দিতে পারবে না।

উনার পড়ানোর কথা ছিল সৈয়দ মুজতবা আলীর বইকেনা গল্পটি। সারাবছরে দুই এক লাইনের বেশি আগায়নি কিন্তু তারপরেও উনার ক্লাসে থাকত উপচে পড়া ভীড়। উনার মত স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ান কাম টিচার আমি আমার জীবনে আর দ্বিতীয়টি দেখি নি। উনার ক্লাসের কথা এখনো মনে পড়ে।

শেষকথাঃ

উপরের লেখাটা পড়ে নিজেরই মনে হচ্ছে এত আনন্দময় সময় আমিও কোথাও কাটাইনি জীবনে। অন্তহীন আনন্দের দিন যেমন শেষ হয়ে যায় তেমনি ঢাকা কলেজের দিনগুলো কর্পূরের মত উবে গেল একদিন। কলেজের জীবন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও খুব ছোট এর ব্যাপ্তি।

এই লেখাটা লিখতে গিয়ে অনেক পুরানো স্মৃতিই সময়ে-অসময়ে হানা দিয়েছ। মনে পড়েছে ঢাকা স্ন্যাক্স আর মালঞ্চর কথা, এলিফ্যান্ট রোডে রেইনবো রেকর্ডিং এর দোকানে কবির ভাই আর মুরাদ ভাইয়ের কথা, কফি হাউসের কথা।

স্কুল আর কলেজ মিলিয়ে প্রায় ১২ বছর বিচরণ করেছি ওই মুল্লুকে। বড় হওয়ার প্রথম স্বাদ মনে হয় আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। তবে ঢাকা কলেজের বেশ খারাপ কতগুলো দিকও আছে। পড়াশুনার কোন চাপ না থাকাতে অনেক ভালো ছাত্রের রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেছে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতি নিতে গিয়ে বুঝলাম বইয়ের অনেক কিছুই অজানা। আমার অনেক বন্ধু মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো সাবজেক্টে ভর্তি হতে পারেনি অন্যদিকে পড়ার চাপ থাকাতে নটরডেম কলেজের ছেলেরা ভালো করেছে বেশ। তাও মনে হয় আমার পুত্র সন্তান থাকলে তাকে ঢাকা কলেজেই ভর্তি করাতাম। বেঁচে থাকুক স্মৃতিময় কলেজ, স্মৃতির ভেতরে এবং বাইরে দুই জায়গাতেই।

সচল নামঃ তাসনীম
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/tmhossain_0

হলিক্রস উই শ্যাল বি ট্রু

...আনন্দী কল্যাণ

স্কুল আর কলেজের মাঝে পার্থক্য ছিল একটা মাঠ। একটা দারুণ সবুজ ঝকঝকে মাঠ। আমাদের স্কুলের মাঠটায় কোন ঘাস ছিল না, লাল বালুর মাঠ ছিল ওটা। তাই আমরা কলেজের মাঠটা নিয়ে খুব লোভ করতাম। স্কুলের ক্লাসরুম থেকে গলা উঁচিয়ে দেখতাম, সাদা সাদা ফ্রক পরা রাজহাঁসের মত আপুরা সারাদিন ওই মাঠে খালি পিটি করে। আমরা ভাবতাম, আহা!

অবশেষে আইল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আমরা মাঠ টপকে কলেজে চলে এলাম। কলেজের দুই বছরে টিচারদের কাছে সবচেয়ে বেশি শুনেছি এই কথাটাই- কোন এক বিচিত্র কারণে হলিক্রস স্কুল থেকে হলিক্রস কলেজে আসা মেয়েদের উনারা খুবই টাইট দিতেন- যে কোন বকাই শুরু হত এই লাইন দিয়ে- "মাঠটা পার হয়েই চলে আসছ তো...!"

আমার স্কুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা কলেজে অন্য সেকশনে পড়ল। প্রথমদিন ক্লাসে দেখি আমার চারদিকে যেই চারজন মেয়ে বসেছে তাদের কাউকেই আমি চিনি না। দশবছর একই স্কুলে পড়ায় অভিযোজন ক্ষমতা শূন্যের কোঠায়, প্রথমদিন সব ক্লাসে মুখ শুকনা করে বসেছিলাম মনে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে স্কুলের বাইরের বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নতুন মেয়েদের সাথে চমৎকার কিছু বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল।

মনে পড়ে, "ট্রমা" শব্দটা প্রথম ওই সময়ে শিখেছিলাম।

আমরা যেই বছর কলেজে ঢুকলাম, সেই বছরই কলেজের গোল্ডেন জুবিলি ছিল। তো আমরা মহা উৎসাহে সবাই বিভিন্ন কমিটিতে ভলান্টিয়ার হয়ে গেলাম। সারাদিন কলেজ ঝাড়ু দিতাম, বিকালে হাঁ করে বিভিন্ন স্টার অ্যালামনাইদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, এই ছিল আমাদের কর্মসূচী।

তো একবার যখন ওরকম ঝাড়ু-পর্ব চলছিল, কিছু সুবেশিনী-সুকেশিনী চলে এসেছিলেন সময়ের আগেই। আমরা প্রবল উৎসাহে ঝাড়ু দিচ্ছি, চারদিকে ধুলা। একজন বলে উঠলেন, "আমার ভীষণ ট্রমা হচ্ছে, এইসব নোংরা মেয়েদের দেখে।"

সারাদিন খেটেখুটে কলেজ পরিস্কার করে ধুলোমাখা চেহারায় দাঁড়িয়ে থেকে ওই কথাটা শুনে কেন যেন সেইদিন থেকে আভিজাত্য শব্দটাকে ঘৃণা করতে শিখেছিলাম।

আমাদের কলেজ অডিটোরিয়ামটা আমার ভীষণ পছন্দ ছিল। বিশাল বিশাল মেঝে সমান জানালা, একতলা সাদা একটা বিল্ডিং, ঘেরা ছিল লিলিগাছ দিয়ে। প্রতিটা বড় অনুষ্ঠানেই আমরা একটা করে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে নাটক করতাম, এই নাটকের ব্যাপারটা ভীষণ উত্তেজনার ছিল আমাদের কাছে। নাটকের নায়ক-নায়িকা হবার মত রূপ বা গুণ কোনটাই ছিল না আমার, কিন্তু মঞ্চের পেছনের কাজে যে কি আনন্দ, আহা!

আমরা থাকতে থাকতেই এই অডিটোরিয়াম, সাথের লাগোয়া লাইব্রেরি ভেঙে ফেলে নতুন কন্সট্রাকশনের কাজ শুরু হল। কাটা পড়েছিল মাধবীলতার ঝাড়, লাল-জবা গাছ। খুব কষ্ট হয়েছিল। অডিটোরিয়াম'টা আগে অনেক ছোট ছিল, সব মেয়ে একসাথে আঁটত না, প্রতিটা অনুষ্ঠান আমাদের দুইবার করে করতে হত, ফার্স্ট ইয়ারের জন্য একবার, সেকেন্ড ইয়ারের জন্য একবার। মজাই হত, দুইবার করে শাড়ি পরতে পারতাম।এখন বড় অডিটোরিয়ামে আলো, মাইক এসবের ব্যবস্থা অনেক ভাল, কিন্তু কেন যেন মনে সেই গাদাগাদি করে ছোট বাসায় থাকার আটপৌরে আনন্দটা হারিয়ে গেছে।

মিত্র স্যারের একটা ঘটনা মনে পড়ে। উনি হঠাৎ হঠাৎ খুব রেগে যেতেন। একবার কিছু মেয়ে ঘন্টা পড়ার পরও পরীক্ষার খাতায় লিখতে থাকায় দোতলা থেকে দেড়শ খাতা নিচে ছুড়ে ফেলেন। ক্লাস অফিসার হওয়ার কারণে নিচে নামি খাতা কুড়াতে, দেখি সিস্টার পলিন অবাক হয়ে দেখছেন খাতা-বৃষ্টি। দেড়শ খাতা ঠিকঠাক খুঁজে পেতে পরের ক্লাসের অর্ধেকটাও আমরা দিব্যি নিচে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। কিছু খাতা বিভিন্ন গাছেও ঝুলছিল, দাদাদের ডেকে খাতা পাড়তে হয়েছিল গাছ থেকে।

আমাদের বাংলা পড়াতেন সিস্টার শিখা। একদমই কমবয়সী একজন সিস্টার। কলেজের বিভিন্ন কাজের সূত্রে একটা অদ্ভুত অসম বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল উনার সাথে। স্কুলে পড়ার সময় সিস্টারদের খুব মহৎ কিছু মনে হত। পরে কলেজে সিস্টার শিখার কাছাকাছি এসে মনে হয় মহত্বের পেছনের বেদনাটাও বুঝতে

পেরেছিলাম। আশ্চর্য সুন্দর দুটো চোখ ছিল উনার, কিন্তু কখনো কাজল পরেন নি, সিস্টারদের কাজল পরার নিয়ম ছিল না। আমার সিস্টার শিখাকে দেখতে ইচ্ছা করত রঙ্গিন শাড়িতে, মাথায় গোঁজা ফুলে, কাজলে।

কলেজের দুটো বছর শিখেছি অনেককিছু, শিখেছি প্রশ্ন করতে, জীবনকে নানা দিক থেকে। স্কুলের সেই কমফোর্ট-জোন থেকে বের হয়ে বাইরের পৃথিবীর আঁচও পাচ্ছিলাম একটু একটু করে।

কলেজের প্রত্যেকজন শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ সেই সবুজ মাঠটার কোণে দাঁড়িয়ে থাকা কাঠবাদাম গাছটার কাছে, কী যে অপলক সুন্দর এক গাছ, পরে অনেক স্বপ্নে আর ভাবনায় ফিরে ফিরে এসেছে ওই গাছটা! আর বাস্কেটবল কোর্টের মাঝখানের সেই গোল দাগটা! আমরা চার বন্ধু গিয়ে বসতাম সেই চারটা খোপে, এখন তাই হয়ত ছড়িয়ে গেছি চারটা মহাদেশে। কতদূর, কতদূর ফেলে এসেছি তোমাকে, প্রিয় প্রাঙ্গণ! জানি, আর ফেরা হবে না। ফেরা যায় না।

সচল নামঃ আনন্দী কল্যাণ
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/anandi_kalyan

অনাকাঙ্খিত দীর্ঘশ্বাস ক্লান্ত কলেজ-জীবনের দিনগুলো

...জুলিয়ান সিদ্দিকী

০১

গুমতা ইসহাকিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৮৩-তে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর মাস তিনেক বলতে গেলে শুয়ে বসে ঘুরে ফিরে আর তাস পিটিয়েই পার করে দিয়েছি। সে সময় আমার গ্রামে আমার সহপাঠী বলতে যারা ছিলো, ক্লাস নাইনে আমার লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার ফলে এবং কিছুদিন নাওতলা ইসলামিয়া মাদ্রাসায় তালেবিল্লি থাকার ফলে তারা হয়ে গিয়েছিলো আমার এক ক্লাস সিনিয়র। জুনিয়রদের সঙ্গে তেমন একটা সখ্য না হলেও আমার গ্রামেরই সোনামিয়া ভাইয়ের কনিষ্ঠ ছেলে ভাতিজা প্লাস বন্ধু প্লাস দু বছরের সহপাঠী আলমগীর।

গাঁ সূত্রে তার বাবাকে ভাই ডাকি বলে সে আমার ভাই-পো হওয়ার কথা। কিন্তু চাচা ভাতিজা হলেও সম্পর্কটি আমাদের বন্ধুত্বে কোনো বাদ সাধেনি। আমি জানতাম ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগ না পেলেও দ্বিতীয় বিভাগ পাবোই। কাজেই পাশ ফেল নিয়ে ভয় আমার ছিলো না। ছিলো কলেজে পড়া নিয়ে। ইচ্ছে ছিলো শহরের কোনো কলেজে ভর্তি হবো। বিশেষ করে আমার পছন্দ ছিলো ঢাকা কলেজ। কারণ, অনেক রথী-মহারথীই ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন বলে বিভিন্ন সময় জেনেছিলাম। আর তা থেকেই মনে মনে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছিলাম ঢাকা কলেজকে।

কিন্তু ঢাকা কলেজে যদি ভর্তির চান্স পেয়ে যাই, কোথায় থেকে পড়বো? কে চালাবে পড়ার খরচ? যদিও মিরপুর পল্লবীতে মেজ ভাই থাকেন। সেখানে আমার ছোট ভাই মাবু আর ন-ভাই দুলাল আগে থেকেই বসবাস করছিলো বলে আমার আর শহরে গিয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই রইলো না। কাজেই স্থানীয় কোন কলেজটিতে পড়বো সেটাই আগে ঠিক করা জরুরি হয়ে উঠেছিলো।

আমাদের গ্রাম থেকে দুটো কলেজেই তখন যাওয়া যেতো। একটি নিমসার জুনাব আলি কলেজ আরেকটি গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান কলেজ। নিমসার কলেজে আগে থেকেই আমার বোন পড়ছিলো বলে সেখানে আমার ভর্তির কোনো আগ্রহ ছিলো না। তার ওপর আমাদের স্কুলের বিএসসি মান্নান স্যারের ভাই সেলিম, আলমগীরের সঙ্গে জোট বেঁধে ঠিক করলাম গৌরীপুর কলেজেই ভর্তি হবো।

ইলিয়টগঞ্জ বাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে গৌরীপুরের ভাড়া তখন একটাকা। আসা-যাওয়া দুটাকা আর আমাদের গ্রামের সামনে মহাসড়ক থেকে মুড়ির টিন বা লোকাল বাসে ইলিয়টগঞ্জ যাওয়া যায় পঞ্চাশ পয়সায়। রিকশায় গেলে এক থেকে দেড়টাকা। কখনো প্রয়োজনে ইলিয়টগঞ্জ থেকে হেঁটেই বাড়ি চলে আসতে পারবো। সে হিসেবে কলেজে আসা যাওয়াটা সাশ্রয়ী বলে বাবাও রাজী হলেন।

ম্যাট্রিকের ফলাফল প্রকাশের পর একদিন সুন্দর সকালে আমি গৌরীপুর কলেজে গিয়ে ভর্তি হয়ে এলাম কৃষিবিজ্ঞান বিভাগে। অংক ভালো লাগতো না (আসলে ভালো বুঝতাম না) বলে নৈর্বাচনিক গণিত থাকা সত্ত্বেও স্কুলে কৃষিবিজ্ঞান চালু হওয়াতে গ্রুপ বদলে ফেলেছিলাম।

কলেজের ক্লাসরুমগুলো ভর্তির সময় দেখতে পারিনি বলে জানা ছিলো না ভেতরের অবস্থা। বাইরে থেকেই দেখেছিলাম পশ্চিমাংশে লম্বা দুটো টিনের ঘর। উত্তরাংশে সেমি পাকা দুটো বিল্ডিঙ। একটি দোতলা বিল্ডিঙ উপরে নিচে একটি করে রুম। যা মহিউদ্দিন পাঠাগার নামে পরিচিত ছিলো।

তো প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকে পুরো মেঝে বালি আচ্ছাদিত দেখে আমার মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গেল। প্রাইমারী থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত এমন বালুকাবেলা সমৃদ্ধ ক্লাস কখনো পাইনি। তাই কলেজের ক্লাস করতে গেলে ঠিক মনোযোগ দিতে পারতাম না। মনে হতো কোনো চরে টুল-টেবিল সাজিয়ে বসে আছি। তো ক্লাস আরম্ভ হতেই আস্তে ধীরে ক্লাসে মনোযোগ তৈরী হতে লাগলো। কিন্তু বেঞ্চে বসে নিচের দিকে তাকালেই মনে হতো ক্লাস থেকে বেরিয়ে পড়ি।

যাই হোক। কলেজ বলে কথা। নিজকে তখন খানিকটা বাহাদুর বাহাদুর মনে হচ্ছিলো। আমাদের প্রথম ক্লাসটা হতো বাংলা। ক্লাস নিতেন জাহানারা আপা। দেখতে ছিপছিপে গড়নের। মনে হতো সারাক্ষণই রেগে আছেন। কিছু বললেই ধাই করে ধমক দিয়ে বলবেন, 'সাটআপ!'

যে কারণে, আপার ক্লাসটাতে নিজকে বড্ড অসহায় মনে হতো। তখন কোনো পত্রিকায় কিংবা কুমিল্লার সাপ্তাহিক আমোদ-এ জাহানারা আক্তার বা খাতুন নামের এক লেখিকার লেখা দেখতাম প্রায়ই। ভেবেছিলাম উনিই বুঝি!

তখন আমার ধারণা ছিলো যে, যাঁরাই বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করেন, তাঁরা সবাই উপন্যাস গল্প আর কবিতা লেখায় পারদর্শী। তো একদিন ক্লাসের সময় আপাকে সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম, "আপা আপনি লেখালেখি করেন?" (সঠিক প্রশ্নটা আজ আর মনে নেই। তবে যদ্দুর মনে পড়ে আমার জিজ্ঞাস্যটি এমন ধরনেরই ছিলো।)

তাঁর জবাব ছিলো, "মাঝে মধ্যে লিখি।"

"পত্রিকায় ছাপা হয়?"

"হয়। আমি জাহানারা ঊর্মি নামে লিখি "

তো সেদিনই আমার মনে এ ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, সাহিত্যর্চচা করতে হয় তো সাহিত্য নিয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমি যদি জানতাম (অবশ্য পরে জেনেছিও) যে, সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীর চেয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরাই সাহিত্য চর্চায় ভালো করে!

তখন কম করে হলেও তিন চারমাস গত হয়েছে। দুচারজনের সঙ্গে মোটামুটি সখ্য হয়েছে। অবসরে কথাবার্তা আড্ডা চালানো যায় এমন। একটি অফ ক্লাসের পরই জাহানারা আপার ক্লাস ছিলো বলে, সেদিনের পাঠ্য অক্ষয় কুমার বড়ালের একটি কবিতা। কবিতাটির নাম আজ মনে নেই। শাশ্বতী না কি যেন ছিলো। থাক সে কথা। পড়তে চেষ্টা করছিলাম। কথায় বলে না, নেই কাজ তো খই ভাজ!

বসে বসে আমার মনে কী দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো, উইংসাং কলমের নিবের কারিশমায় বড়ালকে নিপুণভাবে বিড়াল করে দিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে পাশের একটি ছেলে আমার বইটা নিয়েছিলো। আপা যখন বললেন অক্ষয় কুমার বড়াল, ছেলেটি খানিকটা দুরন্ত ছিলো। সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, "আপা এখানে বিড়াল লেখা আছে।"

ক্লাসের সবাই হাসি চাপা দিলেও আপা গম্ভীরভাবে জানালেন, কেউ দুষ্টুমী করেছে। ওটা বড়াল হবে।

০২

কলেজে আসি যাই। সেলিমও আসে। কলেজে প্রায়ই দেখা হয়। আলমগীরও ক্লাস করে। আমার কাছের মানুষ বলতে এ দুজনই। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছিলো সেলিমের সঙ্গেই আমার সময়গুলো কাটে।

আমি স্কুল জীবনেই সিগারেট টানা অভ্যাস করে ফেলি। অন্যান্য ছেলেরা সিগারেট টানার কারণে ঘরে বাইরে নানা রকম প্রতিরোধ আর শাসনের মুখোমুখি হয়। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে এসবের বালাই ছিলো না।

সিগারেট প্রসঙ্গটি যদিও এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তবুও আমি মনে করি যে, সিগারেট টানা অর্থাৎ ধূমপানের অভ্যাসটি যদি না করতাম তাহলে বোধ করি আমার জীবনে স্কুল-কলেজ এর নাম আর সম্পৃক্ত থাকতো না। যেহেতু আমার শিক্ষা জীবনের সঙ্গে ধূমপানের ব্যাপারটি বিশাল একটি স্থান জুড়ে আছে, তাই মনে করি এ প্রসঙ্গটি বাদ দিলে আমার স্কুল বাদ পড়ে যায়। আর স্কুল বাদ পড়লে কলেজ বলে কোনো প্রসঙ্গও আসে না। সুতরাং ধুমপানের ব্যাপারটিও আমার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে কলেজেও চলে আসে।

আমার লেখাপড়া বিঘ্নিত হওয়ার সংবাদ ইতোমধ্যেই পাঠক জেনেছেন আশা করি। কিন্তু কেন সে বিঘ্ন তা তখন বলার সুযোগ ছিলো না। কিন্তু এখন যেহেতু সুযোগ হয়েছে তাই হয়তো বলতে পারি।

ঘটনা তেমন জটিল কিছু নয় আবার জটিলও। ক্লাস এইট থেকে পাশ করে যখন নাইনে উঠলাম তখন ফিজিক্স কেমিষ্ট্রি আর বায়োলজীর সঙ্গে ইলেক্টিভম্যাথও নিলাম ভালো ছাত্র হওয়ার জন্যে। কিন্তু ইলেক্টিভম্যাথ করতে যেয়ে দেখলাম আমার জানে আর কুলোচ্ছে না। কী করি! চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করলাম। তখনই শুনতে পেলাম শিক্ষক পাওয়া গেলে কৃষিবিজ্ঞান চালু হবে।

অবিজ্ঞানের ছাত্র হতে ভালো লাগছিলো না বলে, আর্টস বা কমার্সেও যেতে চাইলাম না। তাই অপেক্ষা করছিলাম কৃষিবিজ্ঞানের জন্য। ইলেক্টিভম্যাথের বদলে কৃষিবিজ্ঞান নিলে বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়গুলোও রাখা যাবে। তাই কৃষিবিজ্ঞান চালু হতেই গ্রুপ বদলে ফেললাম। কিন্তু দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা হয়ে যাবার পরই একদিন আরম্ভ হলো মাথা ব্যথা। প্রচণ্ড ব্যথা। অষুধ খেয়েও কাজ হলো না। ভাবলাম ঘুমালে হয়তো আরাম হবে। হলো না। ব্যথাটাকে সহ্য করতে চেষ্টা করলাম। শেষটায় আমার জ্বর চলে এলো। জ্বর সারলেও মাথা ব্যথা গেল না। হইচই ঘুরাঘুরি করলে ব্যথাটা একটু ভুলে থাকতে পারি। অন্য সময় খুবই কষ্ট।

তখন বাবা প্রায় পাগলের মত যাকে পান তাকেই ধরেন। ঝাড়ফুক-কবিরাজি-হোমিওপ্যাথি-এলোপ্যাথি কিছুই বাদ গেল না। চোখের ডাক্তার মাথার এক্সরে ফটো দেখে জানালেন মাথায় সর্দি জমে গেছে। চোখে উঠলো চশমা। গরম পানি দিয়ে মাথা ধোওয়ার চিকিৎসা চললো। কাজ হলো না। ততদিনে আমার লেখাপড়া লাটে উঠে গেছে।

মা মাঝে মাঝে বাবাকে অনুযোগ করতে শুনি যে, খুব ছোট বেলায় একটানা নয়দিন মুর্ছিত ছিলাম। তখন বাবা তাঁর সৃষ্টিকর্তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ছেলেটা বেঁচে উঠলে তাকে কোরানে হাফেজ বানাবেন। মা সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলতেন, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি।

যাইহোক, আমি গাছে গাছে রাস্তায় রাস্তায় থাকি। ঘরে বলতে গেলে থাকিই না। এভাবে আমার দিনরাত পার হয়। ঘুমালেও যেন টের পাই মাথাটা কেমন ভারী হয়ে আছে। যাদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক বজায় ছিলো তারা একে একে সরে যেতে লাগলো। লোকজনের দৃষ্টি দেখলে টের পাই কারো দৃষ্টিতে বেশ সহানুভূতি। কারো বা চকচকে আনন্দিত দৃষ্টি।

আমাদের গ্রামে একটি বড় একটি তেঁতুল গাছ ছিলো। প্রায় সময়ই সেটাতে উঠে বসে থাকতাম। গাছটির ডালপালা খুব ঘন ছিলো বলে, ছায়া সুশীতলও ছিলো। এভাবেই একদিন সেখানে বসে আছি, তখনই হঠাৎ খেয়াল হলো, আমি করছি কি? আমার বন্ধুরা সব ক্লাস টেনে উঠে গেছে। আর আমি কিছুই করছি না? এ কেমন জীবন?

তখনই আমার হঠাৎ দিব্যজ্ঞানের মত মনে পড়ে খুবই ছোটবেলা, ১৯৭১- সালের উত্তপ্ত দিনগুলোর কিছুটা সময় গ্রামে ছিলাম, তখন দেখেছি সুরুজ তামাক কেটে বিড়ি বানিয়ে টানতো। তার ছিলো পেটব্যথা। কোনো এক কবিরাজ তাকে বলেছিলো ধূমপান করতে। সে সময় হুকো ছিলো। সুরুজকে দেখতাম হুকো টানতো গুরৎ গুরুৎ করে।

আমার মন যুক্তি দেখালো যে, হুকো টেনে যদি সুরুজের পেটব্যথা ভালো হয়ে যেতে পারে তাহলে বিড়ি সিগারেটে আমার মাথাব্যথা যাবে না কেন?

যেই ভাবা সেই কাজ। সেদিনই একপ্যাকেট রমনা সিগারেট আর একটি দেশলাই নিয়ে তেঁতুল গাছে চড়লাম। কিছুদিন পর এক শনিবার হাটের দিনে ইলিয়টগঞ্জ বাজার থেকে সাতটাকা দিয়ে একটি নারকেলের হুঁকো আর মাখানো তামাক কিনে নিয়ে এলাম। হুঁকোটা দেখতে ছিলো খেলনার মতই ছোট। মাঝে মধ্যে হুঁকো সেবন করতাম। ভালো লাগতো না তেমন। সিগারেটের মত তৃপ্তি পেতাম না। চাচা সম্পর্কীয় গুরুজনরা মাঝে মধ্যে এসে বলতেন, "তর হুক্কাডা ধরা দেহি বাজান!"

এভাবেই আমি নিজকে উন্নীত করছিলাম আর প্রস্তুত করছিলাম লেখাপড়ার জন্যে। যাই হোক সে ফিরিস্তি আর নাই বা দিলাম। মাস ছয়েক পর আমার মনে হলো যে এবার লেখাপড়া শুরু করতে পারবো। আর তখনই একদিন ঢাকা গিয়ে মেজভাইকে ধরলাম। জানালাম স্কুলে ভর্তি হবো।

তিনি একটুও বিস্মিত হলেন না। কেন হলেন না বুঝতে পারি না। এমন কি খুশি যে হয়েছেন তাও বুঝতে পারি না। তিনি জানতে চাইলেন, কত লাগবে?

বললাম, বইখাতা আর ভর্তি মিলিয়ে শ পাঁচেক লাগতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভাবিকে বললেন, "দ্যান, তারে পাশশ ট্যাহা দিয়া দেন!"

এ প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে ভাবির কথা। ব্যক্তি জীবনে আমাদের পরিবারের সদস্যদের কাছে তিনি যেমনই ছিলেন, আমার হৃদয়ে তাঁর স্থান আমার জননীর পাশাপাশি। যদিও ভাবি হিসেবে কোনো কারণে তাঁকে ফুলমার্ক দিতে পারি না, তবুও তিনিই আমার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার স্থানটির অনেকাংশ জুড়ে থাকবেন আরো দীর্ঘকাল। সম্প্রতি তিনি গত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে আমার মনোকষ্ট কারো সঙ্গে শেয়ার করতে পারি নি। আজ সুযোগ পেয়ে সেটা চেপে রাখতে পারলাম না।

ভাবি আমাকে টাকা দিলে সেদিনই গ্রামের বাড়ি ফিরে আসি। পরদিন যথারীতি ভর্তি হয়ে গেলাম নাইনে। সময়টা ১৯৮১।

০৩

আমার মনে পড়ে গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান কলেজে শামসুল আলম নামে আরেকজন শিক্ষক ছিলেন, যিনিও আমাদের বাংলা পড়াতেন। তাঁর পাঠদানের বিষয় ছিলো গদ্য। তাঁকে দেখতাম বেশ হাসিখুশি। দেখলেই মনে হতো তিনি রাগ

করতে জানেন না। জানেন না ছাত্রছাত্রীদের ধমক দিতে। কিন্তু দুর্ভাগার কপাল সব সময়ই যে চড়চড় করে সে কথাটি আমার ক্ষেত্রে অন্তত মিথ্যে প্রমাণ হতে দেখি নি।

একদিন ক্লাসে তিনি হৈমন্তী পড়াচ্ছিলেন। বেশ আনন্দ নিয়েই পড়াচ্ছিলেন। আমি বেঞ্চে বসে আছি। কিছু একটা খাতায় লিখতে গিয়ে আমার দৃষ্টি পড়লো মেঝেতে। নদীর চরের মত দেখতে মেঝেটাকে ঘৃণা করেই বুঝি হাইবেঞ্চের আড়ালে মুখ রেখে থুথু ফেললাম। কিন্তু কী অবাক কান্ড, ধরা পড়ে গেলাম স্যারের চোখে। পড়ানো বাদ দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই ছেলে, এই! বলি কোন জঙ্গল থেকে এসছো, হ্যাঁ?"

স্যারের কণ্ঠস্বরেই আমার খবর হয়ে গেছে। আসল কারণ যদি সহপাঠীরা জানতে পারে তো আমাকে বলতে ছাড়বে না কেউ। প্রায় হালকা খয়েরী রঙের চশমার আড়ালে স্যারের রক্তচক্ষু আমার দৃষ্টিগোচর হলে আসন্ন বিপদের আশংকায় পারলে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলি।

আকলমান্দ কি লিয়ে ইশারাই কাফি! ব্যাপারটা আমার জন্য কেবল যথেষ্টই ছিলো না সেদিন, বাকি জীবনও সেই ধমক আমাকে শিষ্ট থাকতে বাধ্য করবে। স্যালুট শামসুল আলম স্যারকে। যাঁকে ভুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

কদিন পরই শুনতে পাই এরশাদ রাজনৈতিক দল জনদল গঠন করেছেন। সেটার ছাত্র সংগঠনের আহ্বায়ক হতে আমাদের কলেজের থার্ডইয়ারের ছাত্ররা জোর তদ্বির আরম্ভ করলেন। যেদিন এরশাদ চান্দিনা আসবেন সেদিন যে করেই হোক ছাত্র সংগঠনটির (নাম ভুলে গেছি।) আহ্বায়ক পদ পেতেই হবে। দলে ভারী দেখাতে আমরা কলেজের সিংহভাগ ছাত্রই ট্রাকে চড়ে গিয়েছিলাম চান্দিনা উপজেলায়। কিন্তু সেদিন এরশাদ চান্দিনা আসেন নি। আমরা ফিরে এসে স্থানীয় ডোবার ওপর বাঁশের খুঁটিতে পাতা রেস্টুরেন্টে নলামাছ দিয়ে ভাত খেয়ে তৃপ্ত থাকতে চেষ্টা করি।

কলেজ জীবনটা আমার কাছে তখন মনে হচ্ছিলো যে, একটি অসাধারণ জীবন লাভ করেছি। স্কুলের গণ্ডী ছেড়ে কলেজের আঙিনায় পা রাখতেই মনে হয়েছিলো কী একটা হয়ে গেলাম বুঝি! নিজকেও কেমন যেন খানিকটা আলাদা মনে হতো। ছাত্র হিসেবে আমি কখনওই নিজকে ভালো বলে দাবী করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি তবুও কেন যেন শিক্ষকদের শাসনের পাশাপাশি তাঁদের স্নেহ আর ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত হইনি। সে কথায় পরে আসছি।

তো বলছিলাম নিজকে ভালো ছাত্র হিসেবে দাবী করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। আর তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো এই গৌরীপুর মুন্সী ফজলুর রহমান কলেজেই। যিনি ইংরেজি পড়াতেন তাঁর নামটা সঠিক মনে করতে পারছিনা।

সেই ১৯৮৩ সালের কথা। তবুও ভালো যে, কলেজের অনেক কিছুই স্মরণ করতে পারছি। স্যারের নামটা হয়তো রফিক ছিলো তাঁর ক্লাসটা আমার খুবই অপছন্দের ছিলো তিনি যেভাবে ইংরেজি পড়াতেন, আমার মাথায় কিছুই ঢুকতো না। আর সবচেয়ে বড় সমস্যাটি ছিলো, কোনো কিছু আমি নিজে না বুঝলে কারো সাধ্য নেই আমাকে বোঝায়।

ক্লাসের পড়া ঘরে বসেবসে মুখস্থ করি। অপছন্দের বিষয় বলে বেশি পড়লেও পরদিন ক্লাসে পড়া পারি না। এখন মনে হলে ভাবি যে, খুবই সহজ পড়া। তবুও যে পারতাম না কোন কারণে তা আজও রহস্যময়। ইংরেজি লাইনটা পড়ার পর সেটার অনুবাদ করা। হয়তো বা অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজ ব্যাপার ছিলো। কিন্তু আমি পারতাম না। আমার এ করুণ হাল দেখে স্যার কেমন মায়াভরা দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর খুবই মিষ্টি করে বললেন, আর যাই করো, ধানাই-পানাই করে ইংরেজি হবে না।

আজ অবধি স্যারের কথা আমার মনে পড়ে। যা কিছু যেভাবেই হোক, অনুধাবন করি যে, ধানাই-পানাই করে ইংরেজি শেখা যায় না।

কলেজটির আরো একটি ভালো দিক ছিলো যে, প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি বিষয়ের ওপর পরীক্ষা হতো দশ, বিশ বা পঁচিশ নাম্বারের। অবাক করার মত ব্যাপার ছিলো যে, পরীক্ষাগুলোতে নাম্বার কখনো খারাপ পেতাম না। আর তা থেকেই কোনো কোনো শিক্ষকের মনে হতো আমি ছাত্র হিসেবে মন্দ না।

তবে যে কদিন সেখানে ক্লাস করেছি দিনগুলো ছিলো মজার। একদিন শোনা গেল যে, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। কে কোন বিষয়ে অংশ নেবে কমিটির কাছে যেন নাম জমা দেয়। অনুষ্ঠানের আগে।

প্রদীপ বা প্রদ্যুৎ বলে আমারই সহপাঠী প্রতিদিন কোমরে গুঁজে একটি লাল রঙের বাঁশি নিয়ে আসতো। ক্লাস অফ থাকলে আর কোথাও যেতো না। ক্লাসে বসে বসেই বাঁশি বাজাতো। আমিও বাঁশি বাজাতাম। সে সময়টাতে সুজনসখী সিনেমার, "সব সখীরে পার করিতে..." গানটা বাঁশিতে খুবই জনপ্রিয় ছিলো। আমিও গানটা

বাজাতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু সুবিধা করতে পারতাম না। বাদনটা সাবলীল হতো না। একটা পর্যায়ে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলতাম, কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে, আমার সহপাঠী বেশ বাজাচ্ছে। বাঁশির ছ টি ছিদ্রের পরও সে কেমন অবলীলায় সপ্তম অষ্টম নবম পর্যায়ের সুর তুলছে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল রহস্যটি জানার জন্যে।

এর আগে কত না চেষ্টা করেছি রাস্তা-ঘাটে, স্টেশনে-বাসে, হাটে-বাজারে বাঁশি বিক্রেতাদের বাদন কৌশল দেখার জন্যে। কিন্তু তারা বেশ নড়াচড়া করতো বলে ব্যাপারটা ধরতে পারছিলাম না। তো আমার সামনেই যখন সে বাজাচ্ছিলো তার ভেতরে হয়তো তেমন অসৎ ভাবনা ছিলো না যে আর কেউ দেখেই ব্যাপারটা ধরে ফেলতে পারে। তাই সহজ স্বাভাবিক ছিলো।

সেদিন কলেজ থেকে ফিরেই কাপড়-চোপড় পাল্টে বাঁশি হাতে চলে গেলাম সেই তেঁতুল তলায়। চললো আমার সাধনা। হলো না। পরদিন কলেজেই গেলাম না। কাটালাম দুপুর পর্যন্ত তেঁতুল তলায়। ঠিক দুপুরের দিকে ধরে ফেললাম যে, ব্যাপারটা আর কিছু না, বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার ওপরই নির্ভর করে, আনন্দে আমার পুরো শরীর কাঁপছিলো তখন।

পরদিন কলেজে গেলাম বাঁশি নিয়ে। নাম দিলাম বাঁশি বাদনে কিন্তু আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যেটাই হোক না কেন, অনুষ্ঠানটা আর হয়নি। অন্তত আমি যতদিন ছিলাম, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম আর শুনতে পাইনি।

০৪

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান না হলেও একটি ব্যাপার ঘটেছিলো। যা আমার বর্তমানকেও প্রভাবিত করতে পেরেছে, বলতে পারি। ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী ছিলাম না তখন। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হতো না। ছেলেমেয়েরা কেন অমুক দল তমুক দলের স্বার্থে গলা ফাটায় সেটার রহস্য উদঘাটনের দিকে আমার ঝোঁক তখন ছিলো না। তবে আমার ক্লাসের অনেককেই দেখতাম বিভিন্ন দল নিয়ে কথা বলতে।

তো ছাত্রলীগের ছেলেরা একবার ঠিক করলো দেয়াল পত্রিকা বের করবে। যার যেমন ইচ্ছে লেখা দিতে। তবে শর্ত হলো ফার্স্ট-ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা অবশ্যই ছোট হতে হবে। আমারও এক দুর্নিবার শখ চাপলো লেখা দেবো। কিন্তু লিখবো কী? লেখা কাকে বলে তাই তো জানি না। একজন বড়ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম কী ধরনের লেখা দিতে হবে? তিনি জানালেন, এই গল্প-কবিতা-ছড়া-কৌতুক এসব আর কি!

লেখার নাম তো আমিও জানি। কিন্তু কীভাবে লেখে সেটা বলে দেবে কে? তখনই রাস্তায় কুড়িয়ে পেলাম একটি চটি ধরনের পদ্যের বই। ছোট ছোট লেখা। যার নাম কবিতা।

এর আগে আমি কোনো কাব্যগ্রন্থ চোখে দেখলেও বুঝিনি। আমার দৌড় ছিলো যে কোনো গল্প উপন্যাসে। কবিতা বুঝতাম না বলে পড়তে আগ্রহ হতো না। তো সে চটি কাব্যগ্রন্থটি দেখে দেখে নিজের ভেতরে একটি ভাবনা এলো। লেখাপড়া করে যখন কৃষিবিদ হবো আর আমার বিভাগও কৃষিবিজ্ঞান, তাহলে কৃষি বা চাষ-চাষী বিষয়ক কোনো লেখা হওয়া চাই। দুদিনের চেষ্টায় পদ্য আকৃতির একটি লেখা দাঁড় করালাম। আর সেটাই চুপিসারে জমা দিয়ে দিলাম। সপ্তাহ না যেতেই কলেজ প্রাঙ্গণের এক কোণে দেখতে পাই একটি বোর্ডে খানিকটা বড় করে লেখা আছে মিছিল।

কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি এটাই সেই দেয়াল পত্রিকা। আর তখনই জানলাম দেয়াল-পত্রিকা, দেয়ালিকা, ওয়াল-ম্যাগাজিন। আমার জন্যে সবচেয়ে লজ্জা আর বেদনার ব্যাপার ছিলো যে, আমার পদ্যটিই সবার শীর্ষে অবস্থান করছে। যেটা পড়তে গিয়ে মনে হচ্ছিলো হাস্যকর শব্দাবলী দিয়ে কটি লাইন সাজানো আছে। ক্লাসমেটরা জানতে চায় আমার লেখা কোনটি? আমার ইচ্ছে হয় পালিয়ে যাই।

মূলত তখন থেকেই আমার একটি বাড়তি আগ্রহ তৈরী হলো লেখালেখির বিষয়ে। লেখালেখির প্রতি তৈরী হলো ভালোবাসা। নিজের লেখার প্রতি জন্ম নিলো অপার্থিব একটি ভালোবাসা।

সম্পর্কে ভাইপো-কাম-ভাগ্নে আলমগীর খন্দকার লেখাপড়ায় আমার সিনিয়র ছিলো। সে পড়তো নিমসার জুনাব আলি কলেজে। তাকে দেখতাম বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে কুমিল্লার চৌধুরীপাড়াস্থ "সাপ্তাহিক আমোদ। পত্রিকায়

সংবাদ পাঠাতে। যখন তার পাঠানো সংবাদ ছাপা হতো, পত্রিকাটি আমাকে দেখাতো। প্রতি সপ্তাহেই তার নামে ইলিয়টগঞ্জ পোস্ট অফিসে আমেদ আসতো

সে জানালো গৌরীপুর কলেজ থেকে নিমসার কলেজ ভালো। সেখানে বিএনসিসি (বাংলাদেশ ক্যাডেট কোর) ট্রেনিং হয়। সে সময়টাতে আমার মনের ভেতর বাস করছিলো সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার বাসনা। বিএনসিসি'র সদস্য থাকলে সামরিক বাহিনীতে সহজেই জায়গা পাওয়া যায়। কলেজও দোতলা। কলেজবাসে আসা যাওয়ার সুযোগ। আর আমার যে কী হলো, বিএনসিসি'র পোকা যখন মাথায় একবার ঢুকলো সে আর বের হতে চায় না কিছুতেই। কলেজে আবেদন করলাম ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের জন্য। কলেজ কর্তৃপক্ষ বললেন যে, আমাকে এখন কিছুতেই ছাড়া যাবে না।

তবুও আমি ঘ্যানঘ্যান করি। ক্লাস টিচার থেকে আরম্ভ করে প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত। শেষে পিন্সিপ্যাল স্যার জানালেন, আবেদন পত্রে অভিভাবকের সাইন সহ সুপারিশ লাগবে।

বাবাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করে ফেললাম। তিনি সাইন আর সুপারিশ দিয়ে দিলেন। বীরদর্পে পরদিন আবেদনপত্র প্রিন্সিপ্যালের টেবিলে এগিয়ে দিতেই তিনি কেমন অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে তখনই তাঁর মুখটা কেমন ম্লান হয়ে যেতে থাকে। তিনি হয়তো বিশ্বাস করেননি আমি সত্যি সত্যিই বাবার অনুমতি নিয়ে কলেজ পাল্টাতে চাইছি। অবশ্য আমার তখন যে বয়স, সে বয়সে অনেকেই নিজকে তেমন সৎভাবে উপস্থাপন করতে পারে না। তিনি বললেন, "তোমার বাবাকে নিয়ে আসতে হবে। ম্যানেজিং কমিটির সঙ্গে আলাপ করেছি।"

পরদিন বাবাকে নিয়ে যেতেই জানতে পারি যে, আমি খুবই ভালো ছাত্র। পরীক্ষা দিলে বরাবরই আমার ফার্স্টডিভিশন মার্কস থাকছে। অযথা কেন কলেজ বদলাতে চাইছি। তিনি বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন। বাবা গুরুত্ব দিচ্ছিলেন আমার ইচ্ছেকে। কারণ আমি ছিলাম বাতিল ছাত্র। ক্লাস নাইনেই যে ঝরে যেতে বসেছিলো। সে ছেলে ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে কলেজে পড়ছে একান্ত নিজের ইচ্ছে আর আগ্রহেই। শেষটায় প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আমার ক্লাস শিক্ষকদের দিয়েও বাবাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে বললেন, "যাও যাও। গিয়ে আর্মি অফিসার হও!"

আজ বুঝতে পারি তিনি কতটা মনোবেদনা থেকে এ কথা বলেছিলেন। আর শিক্ষকদের মনে কষ্ট দিয়ে আমিও সফল হতে পারিনি। নিমসার জুনাব আলি কলেজে গিয়ে বিএনসিসি'র সদস্য হিসেবে ভালো করলেও ছাত্র হিসেবে খারাপ হয়ে গেলাম। বার্ষিক কুচকাওয়াজে যোগ দিতে পারলাম না অসুস্থতার জন্যে। যে কারণে বিএনসিসির কোনো সনদও আমার কপালে জোটেনি। উপরন্তু আরেকটি প্রাপ্তি আমার ভাগ্যে যোগ হয়েছিলো। আর তা হলো, ১৯৮৫সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করেছিলাম। তার পরের বছর আবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেও আমার জীবন থেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগগুলো হারিয়ে যাচ্ছিলো ধীরে ধীরে। জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোথাও যেতে পারিনি। প্রচণ্ড জেদ ছিলো বলেই জগন্নাথ কলেজের শিক্ষা জীবনের কিছুদূর এগিয়ে যেতে পেরেছিলাম। কিন্তু ছাত্র ভালো হলেও আমার প্রত্যাশা পূরণ হয় নি।

এ প্রসঙ্গে আব্দুল মান্নান সৈয়দ স্যারকে স্মরণ করছি। এম.এ ক্লাসে তিনি আমাদের উপন্যাস পড়াতেন। একবার মাত্র তিনি ক্লাসে বলেছিলেন আমার টিউটোরিয়াল দেখে এবং সবার সামনে খাতাটাকে উঁচু করে ধরে বলেছিলেন, "এই একটিমাত্র টিউটোরিয়ালেই খানিকটা গুছিয়ে লেখার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি।"

কিন্তু হায়! তবুও আমি ফিরেছি শূন্যহাতে। হয়তো বা আমার প্রথম কলেজ জীবনের শিক্ষকদের বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাসের আগুনে ছাই হয়ে গেছে আমার শিক্ষার ভবিষ্যৎ। আমার শত প্রচেষ্টা আর আন্তরিকতাও ব্যর্থ হয়ে গেছে কোনো এক অদৃশ্য অজুহাতে। স্বীকার করতে আমার বিন্দু মাত্র লজ্জাবোধ নেই যে, পরবর্তীতে শিক্ষার দিক দিয়ে নিজকে উন্নীত করার যতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছিলাম তার কোনোটাতেই সফল হইনি।

পরিশিষ্ট:

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কলেজ জীবনের প্রেম বা মেয়ে ঘটিত কোনো ঘটনার কথা বললাম না কেন? আসলেও এমন কোনো ব্যাপার ঘটেনি। সত্যি বলছি! আর মেয়েরা আমার ধারে কাছেও আসতো না। তাদের সঙ্গে সহজ হতে পারতাম না। হয়তো আমিই একমাত্র কলেজ (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর) ছাত্র, যার জীবনে সে সময়কার প্রেম ঘটিত বা বান্ধবী সংক্রান্ত কোনো গল্প নেই।

(উৎসর্গ: নাজমা বেগম বেবির স্মৃতির উদ্দেশে)

সচল নামঃ জুলিয়ান সিদ্দিকী
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/juliansiddiqi

জলবতী মেঘের বাতাস

...তিথীডোর

মেয়ে তুমি বড় হচ্ছোঃ

সত্যজিতের ছেলেবেলার গল্পে আছে-- স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার শেষদিনে তাঁর মনে হয়েছিলো, "এরপর কলেজ, আমি বড় হয়ে গেছি"।

আমার অবয়বে কিশোরী ছাপ প্রবল, এই তো সেদিন, এক পুঁচকে জানতে চাইছিলো আমি এবারের ইন্টার পরীক্ষার্থী কিনা! স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এসে যদি এমন প্রশ্ন শুনতে হয়... বলুন তো কেমন লাগে? হায়, মনের বয়সটাও বোধহয় ওই সতেরোর বেড়াজালেই আটকে আছে; ঘুরেফিরে কলেজ লাইফের কথা মনে পড়ে কেবল!

প্রথম যেদিন ক্যাম্পাসে পা দিই, মুগ্ধতার শুরু সেই মুহূর্তেই! সময়টা ২০০৩, অনেকটা জেদ করেই ভর্তি হয়েছি "সরকারী হাজি মুহম্মদ মহসীন কলেজে"। যেখানে বাণিজ্যের ছাত্রদের পয়লা পছন্দ সাধারণত কমার্স কলেজ। কিন্তু ওই কলেজটা আমার পছন্দ ছিলোনা একরত্তিও। রুক্ষ, একচিলতে ক্যাম্পাস, তাতে ফি সপ্তায় ছাত্রদল আর লীগের মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। পুরো ইশকুলের মধ্যে মহসীনে হাজির কেবল আমিই আর তার ফলও ভয়াবহ! সব্বাই পুরোনো বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা মারে চুটিয়ে, আমি গোঁয়ারের মতো 'একলাটি পথ হাঁটি!'

অন্য দু-চারজন দলছুট যা ছিলো তারাও চেহারা সুরত দেখে ভড়কে গিয়ে কাছ ঘেঁষে না... মহা মুশকিল! কোনমতে নাকমুখ গুঁজে ক্লাস করি, ঘণ্টা বাজতেই সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে ছুট লাগাই... কত্তো বন্ধু ছড়িয়ে ওখানটায়! মাঝে মাঝে নিরীহ মুখ করে ফিজিক্স/ বায়োলজির ক্লাসও যে করিনি এমন নয়। অফ পিরিয়ডগুলো কাটাতে হবে তো...

আমার আকাশ দেখা ঘুড়ি। কিছু মিথ্যে বাহাদুরিঃ

কলেজের দুবছর হয়তো এভাবেই কেটে যেতো, 'শাফিন' নামের এক মায়াবতী আচমকা বন্ধুত্বের হাত বাড়ালো। 'সবসময় এতো গম্ভীর হয়ে থাকো কেন'— এ প্রশ্নের জবাবে হেসে ফেলেছিলাম...

পরিচয় গাঢ় হতে জানা গেলো খামখেয়ালী বালিকাটিও ভীষণই কবিতাপাগল! মৌসুমী ভৌমিক আর লোপামুদ্রার গানের সঙ্গে ওসময়ই পরিচয়... ফাঁক পেলেই দুটোতে ছাদে উঠতাম। বিশাল পাহাড়ি কলেজ বাউন্ডারির এক্কেবারে আলাদা অংশে কমার্স ফ্যাকাল্টি, মস্ত ছাদের মাথায় সত্যি দাঁড়াতো আকাশ! অসংখ্য কড়াই আর রেন্টি গাছের সবুজে চাঁদোয়ার ফাঁকে নীল-শাদা মেঘ... উফ্, কি যে সুন্দর!

শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতিঃ

মহসীনের সায়েন্স আর আর্টস বিভাগে বন্ধু ছিলো মেলা! তারা মোটেই আমার মতো অমিশুক নয়, অবলীলায় বন্ধু বাড়ায়... কমন ফ্রেন্ড হিসেবে কদিন পরে আমার সঙ্গেও খাতির জমে। রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে চট্টগ্রাম কলেজ, কাজিন বাঁধন আছে... আছে আরো কত চেনা মুখ। সময় পেলে আমরা যাই, ওরাও আসে। শহরের অন্য কলেজগুলোতেও সখাসখিরা ছড়িয়ে, মাঝেমাঝেই ওরাও হাজির হয়... ভোল পাল্টে (মানে এপ্রন কিংবা কামিজের রঙ বদলে, তখনো আইডি কার্ড হাতে আসেনি) আমরা বিচ্ছুরাও চক্কর মেরে আসি কর্মাস কিংবা সিটি কলেজে... হৈহৈরৈরৈ কান্ড আর কি!

সবচেয়ে মজা হতো দলের কারো জন্মদিনে, তিনদিন ধরে শলাপরামর্শ চলছে তো চলছেই... কী কেনা হবে? নানা মুনির নানা মত। তার ওপর বাজেটস্বল্পতা (হাতখরচের দুপাঁচ টাকাই সম্বল কি না) তারপর যোগ্য তিন-চারজন (যারা দর কষতে পটু) যেত মার্কেট চষে বেড়াতে... অবশেষে, নিদিষ্ট দিনে মহানন্দে বালক/ বালিকাটির গলা কাটা! এই কাটাকাটির কাজ কখনো হতো প্যারেড মাঠের পাশের 'ফ্যান্টাসি', মেডিকেলের উল্টোদিকের 'লোটাস' অথবা ট্যাঁকের জোর বেশি হলে মেহেদীবাগের 'কফি- ইনে'...

এখন মনে হয় ক্লাস, কোচিং, দস্যিপনা এই তিনচাকার সাইকেল কি করে চালাতাম একইসাথে!

আমাদের গ্রুপে বেশ কজন ছিলো যাদের এক নামে চিনতো সবাইই... লোরা বিখ্যাত হয়েছিলো নবীন-বরণে গান গেয়ে, সেটা গলার কারুকাজে নয়... বালিকাটি ছিলো প্রথম শ্রেণীর স্টেজ পারফর্মার। অমন কট্টর পরিবেশেও (মহসীন এবং চট্টগ্রাম এই দুটো কলেজ পুরোপুরি ছাত্রশিবির নিয়ন্ত্রিত ছিলো, এখনো বোধহয় তাই) "গাইজ, উড ইউ লাইক টু জয়েন উইদ মি? লেটস এনজয়..." এইসব বুলিটুলি ছেড়ে সে প্রত্যেকটা মানুষকে নাচিয়ে ছেড়েছিলো ওইদিন! রুহিনা, সুমাইয়া, মিশু, পিংকি, নাদিয়া এরা খ্যাতি পেয়েছিল রূপের গুণে! এটাই ছিলো আসলে কলেজ লাইফের সবচেয়ে মজারু দিক...

বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই প্রথমবারের মত কো-এডে এসেছে, ধরাবাঁধা নিয়মের রাশ আলগা হয়েছে খানিকটা আর ইয়ে, বয়সটাও তো কম! অল্পদিনের জানা শোনাতেই যুগল রূপে ময়দানে নেমেছে অনেকে, কেউ ঢাকঢোল পিটিয়ে সদর্পে... কারো গল্প জানা গেছে লুকোচুরির পর্দা উল্টে। ত্রিভুজ প্রেমের কোন কোন কাহিনী আবার কথা কাটাকাটি, হাতাহাতি হতে হতে গড়িয়েছিলো কলেজ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত!

কচিকাঁচা এসব ভালুবাসার ফল যে আদৌ ভালু নয় সেটা টের পাওয়া গেছে পরে। অভিভাবকের ইচ্ছায় এবং পাত্রীর ঘোর অনিচ্ছায় খুশবুর বিয়ে হয়ে যায় সেকেন্ড ইয়ারেই... অন্য জুটিদের বেশিরভাগই ফলাফল বিপর্যয়ের মাধ্যমে সেই প্রমাণ দিয়ে গেছে।

সাধে কি আর কয়, 'পেমের নাম বেদানা'!

ফার্স্ট ইয়ার উইথ কেয়ারঃ

এসএসসির রেজাল্ট আশানুরূপ না হওয়ায় প্রথমদিকে সিরিয়াস ছিলাম খুব। পরিবহন ধর্মঘট কিংবা ঝড়-তুফান সবকিছুকে বুড়োআঙ্গুল দেখিয়ে হাজির হতাম ক্লাসে... সেকেন্ড ইয়ারে চূড়ান্ত ফাঁকিবাজি করে ডিসকলেজিয়েট পর্যন্ত হয়েছি! শেষমেষ ফলাফল অবশ্য স্যারদের অখুশি করেনি... তবে বলতেই হয় তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সরকারি কলেজগুলোর চাইতে ক্লাস, পরীক্ষা সবকিছু ছিলো অনেক নিয়মিত আর সুশৃঙ্খল।

নেহায়েত নিরীহ মানুষ, কলেজে "ডিবেটিং সোসাইটি" ছাড়া আর কোন বির্তকে নাক গলাইনি কখনো... পাংকু একদল পুলাপান ছিলো, সিগারেট ফুঁকতো বলে উহাদের সযত্নে এড়াতাম!

ভাল্লাগতো ইংরেজীর আতাউর রহমান স্যার আর শুক্লা ম্যামকে... মানানসই সাজ, বিশুদ্ধ উচ্চারণ আর স্টুডেন্টদের সঙ্গে একদম বন্ধুর মতো হয়ে ওঠা; এসব কারণে ম্যাম ছিলেন ভীষণ জনপ্রিয়!

লেজের কথাঃ

পাশ করে বেরিয়ে আর কলেজে যাইনি কখনো। সেদিন পিপিদার ইবুকের ঘোষণা পড়ে আর থাকা গেলো না...

বিকেলের দিকে, সব ক্লাস শেষ তখন.. হোস্টেলের ছেলেরা ছাড়া কম্পাউন্ডও প্রায় ফাঁকাই।

ঘুরে ঘুরে ফ্রেমবন্দী করলাম স-ব; প্রশাসনিক ভবন, লাইব্রেরি, ক্যান্টিন, স্কাউট ডেন, কলেজ মসজিদ, শহীদ মিনার... শাটার চাপতে গিয়ে কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়ে, 'বিশাল চরাচরে মিশে যায় এক কুচি উষ্ণ বাতাস!'

সচল নামঃ তিথীডোর
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/tithydor

স্কুল ইউনিফর্ম পড়া লোকটি

...সুহান রিজওয়ান

আগস্টের ২৫ তারিখ, সাল ২০০৪। তাঁর সাথে প্রথম দেখা হয়েছিলো ওই দিনটায়। ভদ্রলোকের পরণে ছিলো আদ্যন্ত মফস্বলের বয়েজ স্কুলগুলোর ইউনিফর্ম।

...ঠাট্টা নয়, সত্যিই তাই ছিলো। ধবধবে সাদা হাফহাতা শার্ট, গুঁজে রাখা কালো প্যান্টের মাঝে, চোখে ধাতব ফ্রেমের তেলাপোকা রঙের চশমা। নটর ডেম কলেজে আমাদের ছাত্রত্বের আয়ূ তখন মাত্র তিনটে পিরিয়ড। তিনি ক্লাসে ঢুকলেন, ডায়াসের উপরে চেয়ারে বসে চোখে স্বপ্ন আর হৃদয়ে আশা নিয়ে বসে থাকা স্পন্দিত বক্ষের শ'দেড়েক সদ্য নটরডেমিয়ানের আসনবিন্যাস যথাযথ আছে কি না- তা দেখে নিলেন এক নজর, তেলাপোকা রঙের ধাতব ফ্রেম নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। এবং মুখ খুললেন।

" কী করি, কেনো করি, জানতে চাই...। আমরা তো স্যার সবা-আ-ই এ প্লাস। আই ?? ... নটোরডেম কোলেজে প্রথম পরীক্ষায় অঙ্ক দিসে আটটা। দোস্তোরে জিগাই- কয়টা হইলো স্যা-আ-র ?? ... কয় চাইরটা দিসি, দুইটা ভুল, একটা সন্দ আসে...

অভিজ্ঞ ডাকতার যেমোন রোগীর নাড়ি ধরলেই বোলতে পারে, তার কি অসুখ- আমিও তেমন আপনাদের অসুখ ধরতে পারি স্যা-আ-র। ...ঐ যে, সাতাইশ বচ্ছরের অভিজ্ঞতা স্যা-আ-র।..."

বলা বাহুল্য, নটরডেমিয়ানেরা নিজে ছাড়া অপর কারো ভাব নেয়া সহ্য করে না। অতএব, এই অযাচিত ভাব নেয়া লোকটিকে আমরা প্রথম দিনেই বেশ অপছন্দ করে ফেললাম। আমাদের নির্বাচিত শ্রেণী প্রতিনিধি বরুন সেই প্রথম ক্লাসেই ভদ্রলোকের ধমকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।

অঙ্ক করাতে এসে পরের কয়েকদিন ভদ্রলোক পড়ালেন অদ্ভূত সব 'অপ্রয়োজনীয়' জিনিস। 'রাশি কাকে বলে জানতে চাই স্যার !!' অথবা 'সাইন থেটা কারে কয় ??' কিংবা 'কুন বলতে আমরা কী বুঝি ??'... আশ্চর্য! – আশ্চর্য!! ...

অথচ দিন কয়েকপরে দেখা যায়, আমার মত দু'চারটে গাবর বাদে গ্রুপ ফোরের মোটামুটি সকল ছাত্র গণিত বস্তুটার ভেতরের অংশ ধরে ফেলেছে। খালি চার দিয়ে ভাগ করে দুই যোগ আর সাত বিয়োগ করাটা যে অঙ্ক কষার আসল উদ্দেশ্য না, এইটা বুঝে নিয়ে অঙ্ক করতে আমাদের বেশ মজাই লাগে। এবং ভালো লাগতে থাকে স্কুল ইউনিফর্ম পড়ে প্রতিদিন পড়াতে আসা লোকটাকেও।

তবে এই লোকটার ক্লাস করা মহা ঝামেলার বিষয়। তাঁর ক্লাসে পাশের ছেলের খাতায় বেইলী রোডের কলেজটা নিয়ে আজেবাজে কথা ছড়ানো যায় না, ফিজিক্সের প্র্যাকটিক্যাল খাতা লেখা যায় না, মাসুদ রানা পড়া যায় না, কলম দিয়ে সামনের বেঞ্চের লুথা ছেলেপিলেরেও গুঁতানো যায় না। ধরা পড়েছো কী মরেছো। "এই লাল গ-ঞ্জী, তুমি দাঁড়াও!" উঠে দাঁড়ানোর পর লাল গেঞ্জীর আক্ষেপের সীমা থাকবে না। তাকে "কোন্ ইশ,কু-উ-ল ??" এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, তাকে জানানো হবে তার এরূপ আচরণ নটর ডেম কলেজের দীর্ঘ ঐতিহ্যের পরিপন্থী, ঢাকা শহরের অলিতে-গলিতে সদ্য-কলেজ-ছাত্রের জন্যে ছড়িয়ে থাকা অগণিত প্রলোভন সম্পর্কে তাকে মিনিট পাঁচেক আলোকিত করা হবে।

আস্তে আস্তে দিন কেটে যায়। আমরা নটর ডেমের আলো-বাতাস পেয়ে চালাক-চতুর হয়ে উঠি। অঙ্কের ক্লাসে মাঝে মাঝে প্রক্সি দিতে নতুন কোন শিক্ষক আসেন। আমরা তাঁদের সাথে ব্যবহার করি সেই রামকুমড়ো তর্কালঙ্কারের মতন, ক্লাস শেষে বলি- "বালাই ষাট !! কীসব ছাঁইপাশ পড়ায় দেখেছিস নন্টে ?? ... এরচেয়ে আমাদের স্কুল ইউনিফর্ম পড়ুয়া ঢের ভালো!"

দেখতে দেখতে খাতার পাতা ফুরোয়, সাথে ফুরোয় ফার্স্ট ইয়ার। সেকেন্ড ইয়ার যায় আলোর বেগে। পরিচয়পত্র পুরোনো হয়, পুরোনো হয় সায়েন্স ক্লাবের আড্ডা আর গুটিবাজি, পুরোনো হয় স্কুল ইউনিফর্ম। একদিন শেষ বিকেলে তাই স্কুল ইউনিফর্ম পরিহিত লোকটাকে ডায়াসে দেখে আমরা খেয়াল করি যে নটর ডেম কলেজে আমাদের শেষ ক্লাস হয়ে যাবে এখন- চিরদিনের মত। লোকটা কিন্তু আপন খেয়ালে সম্ভাব্যতার তাস ভাগাভাগি সংক্রান্ত কিছু একটা বোঝান আমাদের। কেবল ঘণ্টা বাজার সাথে সাথে ধাতব ফ্রেমের তেলাপোকা রঙের চশমাটা নামিয়ে রাখেন চোখ থেকে। কেনো জানি তাঁকে বড় দুঃখিত দেখায়। মনে হয় তিনি যেনো বহু দূর থেকে আমাদের দেখছেন; যেমন দেখেছেন আরো সাতাশ বছর ধরে। কেউ আমাদের বলে দেয়নি- অথচ আমরা জেনে যাই, শেষবারের মত তিনি আমাদের

সাথে কথা বলবেন। এবং বলেন- "আমি স্যার লোক অনে-এ-এক খারাপ। আপনাদের স্যার বহু-উ বকাবকি করসি। ... কিন্তু স্যার একটা বিষয় খেয়াল রাইখেন, আমি স্যার বকাবকি করসি আপনাদের ভালোর জন্যে।... আপনাদের মঙ্গলের জন্যে স্যার।"

স্কুল ইউনিফর্মের লোকটা ডায়াস থেকে নেমে করিডোরে হাঁটা ধরেন।

এরপর কী হয়েছিলো, তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। কেবল এটুকু জানি, নটর ডেম কলেজের তিনতলার ৩০১ নম্বর রুমের মাঝে ছড়িয়ে থাকা দেড়শ জন 'আমি' একই সাথে উঠে দাঁড়ায়, মাথা উঁচু করে হাততালি দিয়ে যায়, আবেগে-শ্রদ্ধায়। স্কুল ইউনিফর্ম পড়ে থাকা লোকটাকে আর দেখা যায় না। ঝাপসা চোখে কতটুকুই বা আর দেখা যায়...

... ভুল বললাম। পরিষ্কার চোখেও দেখা যায় না। জওহরলাল সরকার স্যারের মতন মানুষগুলো এই অসময়ে বড় দুষ্প্রাপ্য। তাঁদের কেবল জন্ম হয়, মৃত্যু হয় না কোনদিন।

সচল নামঃ সুহান রিজওয়ান
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/shu77han

কলেজের কঠিন দিন

...মিথুন কায়সার

'এরপর আবার কোন কলেজে যাব!' ঠাণ্ডায় ঝিম ধরা মাথায় বোধের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে আসছে এই চিন্তাটা। বিপদটা আরেকজনের উপর দিয়ে গেছে, তার শোকরানা বাবদ জাহাজের প্রথম শ্রেণীর সূধী যাত্রীবৃন্দ পরার লুঙ্গী, গায়ের শাল, পায়ের স্যান্ডেলের সাথে দুচারটা দশ-পাঁচ-টাকার নোটও গুঁজে দিচ্ছেন হাতে। সাথে নতুন জীবনে অভিষেকের অযাচিত শুভাশীষ। কেটেছে থুতনীর নীচে। বাঁধার জন্য খুব কঠিন জায়গা। প্রাথমিক সাহায্যের বাক্সে প্লাষ্টার না থাকায় মাফলারের মতো গজটা পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে ব্যান্ডেজ। কখন ভেজা প্যান্ট খুলে লুঙ্গি পরলাম, গায়ে শাল এবং পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল এলো সেটা ঠিক টের পেলাম না।

চোরকে বাজারে যে কেউ প্রথম কিলটা দিলে পরের কিলগুলো দেয়ার জন্য লোকের অভাব হয় না। অনেকটা সেভাবেই কে যে প্রথম নোট টা ধরিয়ে দিলো! তাকেই বোধহয়, "লাগবে না, অনেক ধন্যবাদ!" ধরনের কিছু বলতে গিয়ে মুখ না খোলায় টের পোলাম মাথার সাথে থোতা বাঁধা। হয়তো প্রথম ভদ্রলোক আরো কাউকে অনুপ্রাণিত করে থাকবেন। আমার কথা বলতে চাওয়াটা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন ভেবে বেশ কিছু নোট জমা পড়ল হাতে। এর আগে দিনাজপুর থেকে একটু ভিন্ন কায়দায় যোগাড় করা টাকাটা ছিল প্লাস্টিকের বাঁধাই করা পকেট নোটবুকের মলাটের ভেতর। নোটবুকের বর্তমান গ্রাম-পোষ্টাপিস না জানা থাকায়, এই অযাচিত দানটা আনন্দ চিত্তেই গ্রহণ করছিলাম। একটু আপত্তি না দেখালে ব্যাপারটা ভিক্ষুকের মতো মনে হতে পারে। আর ভিক্ষুককে কেউ ভিক্ষা দেয় না। কিন্তু টাকার এখন খুব দরকার। এই অবস্থায় ভিক্ষুক হয়ে গেলে দাতারা পাত্তা দেবে না। সেই ঝুঁকিটা এখন আমি নিতে পারি না। তাই আপত্তি টাইপের একটা কিছুতো দেখাতে হয়।

বাহাদুরাবাদ থেকে তিস্তামুখ, নাকি উল্টোটা? এখন আর ঠিকমতো মনে করতে পারছি না। কিন্তু অনেক ঘটনার অণু-ঘটনার মতো দিনাজপুর থেকে রেলযোগে ঢাকা আসার পথে এমন একটা খেয়া ঘাট আছে, যেখানে রেল ছেড়ে লোকে জাহাজে সমুদ্দূর পাড়ি দিয়ে আবার রেলে চড়ে। দুর্ঘটনা দিনাজপুর থেকে যে রেলে এসেছি, সেটা থেকে নেমে জাহাজে উঠার সময়।

কলেজের স্মৃতির সঙ্গে এই সব ঘটনা-দুর্ঘটনার সম্পর্ক একটু বেখাপ্পা লাগছে, তাই না? তা হলে শুনুন ব্যাপারটা খোলসা করেই বলি। বল সাবানের খালি কাঠের বাক্স পাঁচ টাকায় কিনে এনেছেন বড় ভাই। কবুতরের খোপ বানানোর জন্য। বাক্সের খোলা দিকটা তাকের মতো করে রেখেছি বই-খাতা। তার সামনে খড়ের উপর হোগলায় পদ্মাসনে বসে এনথ পদের মান নির্ণয় করি। পরীক্ষা শেষ হলে বড় ভাইকে বাক্স ফেরত দেবো। বাবা বিড় বিড় করে; পড়তে গিয়ে খামাখা তেল খরচ।

আমার পাশের খবর পাড়ার লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু পাস করে পড়লাম আরেক বিপদে। ইচ্ছে করে ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ি। এদিকে কুমিল্লা যাওয়ার গাড়ি ভাড়া যোগার করাই মুস্কিল! কিন্তু জাকিরের মতো আমিও ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ব। দুলাভাইয়ের বাড়িতে থাকে জাকির। তার চেষ্টায় ঠিক হলো লজিং। বলাই বাহুল্য এটা আমার প্রথম লজিং না কাজেই খুব একটা ভয় পেলাম না। পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে ভর্তি পরীক্ষার আগেই লজিং-এ উঠলাম কাঁথা-বালিশ-মশারি নিয়ে।

মৌখিক পরীক্ষার তালিকায় আমার নাম। খুশী না। মহা খুশী। কিন্তু এ টু দি পাওয়ার জিরোর মান আমি জিরোই বললাম। আমার এমন অভ্রান্ত সত্য স্যারেরা বিশ্বাস করলেন না!

কি আর করা! ভর্তি পরিক্ষার গুষ্টি কিলিয়ে নাম তুললাম কুমিল্লা কলেজে। ছাত্র ইউনিয়নের সাথে স্কুলে থাকতেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এরশাদের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে নেমে গেলাম আদা জল খেয়ে। ভিক্টোরিয়া কলেজে যাই ভাষণ দিতে। সেই কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় পাশের সিটে বসা ছেলেটার সাথে একদিন দেখা। আমাকে কলেজে না দেখে ও একটু অবাক। আমি এ টু দি পাওয়ার জিরোর মান জিরো বলার পর আর রেজাল্ট দেখতে যাই নি। কিন্তু ও জানালো আমি পাশ করেছিলাম। কিন্তু এখন ভাবি আমার মতো গাধার ভিক্টোরিয়া কলেজে না পড়াটাই ভাল হয়েছে। তা ছাড়া তখন পড়ালেখার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিলো এরশাদ হটানো। এভাবেই একের পর এক গণআন্দোলনের মাধ্যমে একদিন অর্জিত হবে সত্যিকারের গণতন্ত্র। শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না কোন শিশু। ভাত-কাপড়-জমি-কাজের নিশ্চয়তা পাবে দেশের সব নাগরিক। নিজেকে এমন একটা আন্দোলনের প্রথম সারির কর্মী ভেবে বুকটা ফুলে উঠতো গর্বে।

ভিক্টোরিয়া কলেজে স্বপ্না রায়ের সামনে বাংলার ক্লাসে ছেলের অভাব নেই। রাতে। একান্ত নিভৃতে। স্বপ্না রায়কে প্রেয়সী ভেবে স্বপ্ন দেখার ছেলে অনেক আছে। শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্নে অন্তত আমি বিভোর থাকি।

এক বাড়িতে দুই সংসার নিয়ে আমার লজিং বাড়ির মালিক খুব কষ্টে আছেন এমনটা বলা যায় না। আলাদা চাল-চুলো-পান-চুন থেকে মাষ্টার পর্যন্ত। ছোট বেগমের ফুটফুটে বাচ্চাগুলো আমি পড়াই। বড় বেগমের ছেলে-মেয়েরা নামাজী মাষ্টারের পিটুনী খায়। এদিকে এতো ছোট মায়ামায়া বাচ্চাগুলোকে মারতে পারি না। শাসন না করলে বাচ্চারা মানুষ হয় না। একদম ছোটটা এখনো স্কুলেই যায় না। মাষ্টারের ঘাড়ের উপর বসে। মাষ্টার আজান দেয় না। নামাজ পড়ে না। বড় বেগমের মাষ্টারের সাথে আল্লা-খোদার অস্তিত্ব নিয়ে আগুম নিগুম তর্ক করে।

অনেক সময় শহরের বাইরে বক্তিমা ফক্তিমা দিয়া মাগরেবের আযানের আগে বাড়ি ফিরতে পারি না। বড় বেগমের শিবির মাষ্টার মিটিং মিছিলে দেখে ফেলে আমাকে। আমি কম্যুনিষ্ট। সেটা এখন আমার পিচ্চি পিচ্চি ছাত্র-ছাত্রীরা জানে। কম্যুনিষ্টরা মানুষের মাংস খায়। পকেটে পিস্তল রাখে। মানুষ খুন করে। আমার এই লজিং-এর ছেলেমেয়েরা অন্তত সমাজতন্ত্রীদের এই সব অপবাদটা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রতিদিনের দিনলিপিতে বাড়ীর কর্তার হুশ আসে। বাচ্চাদের ফলাফল এর চেয়ে ভাল কখনো ছিল না। সে অভিযোগ না থাকায়, নামাজ রোজার সাথে যোগ হয় সময় মতো বাড়ি ফেরার শর্ত।

অন্য দিকে ভারী হয় এরশাদের দল। হালুয়া-রুটির কুত্তারা হামলা করে কলেজে। অভ্যাস মতো সেদিনও কলেজে হাজিরা দিতে গিয়ে থেমে যাই গেটেই। কুমিল্লা জেলার ছাত্র ইউনিয়নের এজিএস হামলা দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে মনোবল ভেঙ্গে যাবে সাধারণ ছাত্রদের। তাছাড়া তাদের কোন বিপদ হলো কি না, সেটাও দেখতে হবে। এগিয়ে যাই গলা উঁচু করে। ফটকের চৌকাঠের সামনে মাথাটা নীচু না করলে হয়তো গলাতেই পড়তো রামদায়ের কোপটা। এমন অবস্থায় গণ্ডগোল মিটানোর চেয়ে প্রাণ বাঁচানোই বেশী যুক্তির। দেয়াল টপকে ভেগে গেলাম বড় ভাইদের কাছে। থানা পুলিশ সব এখন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের খুঁজছে। কুমিল্লা কলেজের ছাত্র উইনিয়নের জিএস আমি। চাপাটা ভাল মারতে পারি বলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রায় সব মিটিংয়ে বক্তৃতার জন্য এগিয়ে দেয়া হয় আমাকেই। আমরা পুলিশকে বড় ভয় পাই। কাজেই এখন যতদ্রুত সম্ভব গা ঢাকা দিতে হবে।

পকেটে কি আছে জানি না। কোথায় যেতে হবে তাও অজানা। মগের মুল্লুক। আত্মরক্ষার চেষ্টা পর্যন্ত করি নাই। তার পরেও দোষ আমাদেরই। পুলিশ দুষ্কৃতিকারী হিসাবে খুঁজছে আমাদেরই। ঝাউতলা তেপথায় দাঁড়িয়ে এইসব ভাবনার ভীড়ে থামলো ঢাকাগামী একটা বাস। ঠিক আমার সামনে। ভাবনায় গতি আনার জন্য ঝুলে গেলাম বাসে। এমন একটা সময়ে কলেজে পড়ছি, যখন এরশাদের মতো বেহায়ারা আঁকড়ে আছে ক্ষমতা। পড়ালেখা জিনিসটা তেমন ভাল বুঝি নি কখনো। মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলাম শিশু। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা প্রভাবিত আলোড়িত হয়েছি অনেক। পুরানো বাংকারে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলেছি কতো।

পাকিস্তানী খান সেনাদের কুপোকাত করে গেছেন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা। আন্দোলন করে এরশাদকে হটানো অস্ত্র হাতে যুদ্ধে যাওয়ার মতো ভয়ঙ্কর কিছুতো নয়। কিন্তু এরশাদের পক্ষে এখন অনেক লোক। যে যতো বেশী হিংস্র সেই এরশাদের দলে তত ক্ষমতাশালী। কাজেই এরশাদ পার্টির সমর্থকরা নৃশংসতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার জবাব দেয়া কঠিন। স্বাধীনতার সংগ্রামী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিজাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে জেল-জুলুম-হুলিয়ার শিকার হয়েছে। কিন্তু এরশাদের গুণ্ডারা কেউ বিদেশী নয়। ডর-ভয়ের সাথে পুলিশের হয়রানী মোকাবেলা করে একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরিক হওয়া আমার মতো হাভাতে সংসারের ছেলের পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে নিচ্ছি, মনে মনে।

গুলিস্থান থেকে কমলাপুর রেল ষ্টেশনে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে এসে দাড়ালাম প্লাটফর্মে। ট্রেন কোথায় যাবে জানি না। বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘোরাফেরা করে পুলিশের নজরে পরা ঠিক হবে না। তাই উঠে পড়লাম ট্রেনে। একে একে উঠলেন অনেক ভদ্রলোক। কে কোথায় যাবেন এমন কথা-বার্তার আভাস পেয়ে হকারের কাছ থেকে একটি বিচিত্রা কিনে, তাতেই লুকিয়ে রাখলাম মুখ। পকেটের শেষ কড়ি একটা সিকি দিয়ে দিলাম ভিখেরীকে।

একসময় চলতে শুরু করে ট্রেন। নগর-বন্দর পেরিয়ে শহর থেকে অনেক দূরে নীল আকাশ ছেড়ে সবুজ দিগন্তের নীচে পালিয়ে গেল লাল সূর্যটা। ট্রেনের ম্লান আলোকে টিকিট দেখতে এলো চেকার। বিচিত্রার বাঁ পৃষ্ঠা পড়া শেষ করে ডান পৃষ্ঠায় নিলাম দৃষ্টি। দুনিয়ার খবর নেয়ায় এতো মশগুল দেখে আমার টিকেট আর দেখতে চাইল না চেকার। বিনা টিকেটে রেল ভ্রমণের এই পদ্ধতির কথা শুনেছি

বহুবার। এবার হাতেনাতে পরখ করার সুযোগ পেলাম।

ঝিমুতে ঝিমুতে কখন যে থেমেছে ট্রেন! সবাই নেমে যাচ্ছে। ভাবলাম কোথায় এলাম জায়গাটা একটু দেখি। সবাই যেদিকে মিছিলের মতো এগিয়ে যাচ্ছে আমি মিশে গেলাম তাদের দলে। এক সময় নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা জাহাজে। লোকের কথা-বার্তা আলোচনা থেকে অনুমান করে বুঝলাম, এই জাহাজ থেকে নেমে আবার ট্রেনে উঠতে হবে। গফরগাঁও পার হয়ে আরো অনেক পথ পার হলে শেষ গন্তব্য দিনাজপুর। ভাবলাম ভালই হলো। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া না হোক কুমিল্লা থেকে দিনাজপুর পর্যন্ত যাওয়া হবে।

ট্রেনের জানালা দিয়ে দিনাজপুর লেখাটা পড়তে পারলাম। সকাল হয়ে গেছে। শেষ কখন খেয়েছিলাম মনে নেই। ঘুমে চোখ খোলা রাখা কঠিন। ট্রেন থেকে নেমে লম্বা হওয়ার মতো একটা গাছতলা বা রাস্তার পাশ খুঁজছি। সব মানুষের জীবনে শুরু হয়ে গেছে আরেকটা দিনের কর্মচঞ্চলতা। কোথাও বিশ্রামের জায়গা নেই। চক্কর খাচ্ছি বার বার একই জায়গায়।

আগ বাড়িয়ে আমার বয়সী একটা শ্যামলা-পাতলা ছেলে জিজ্ঞেস করেই ফেললো।

-কি খুঁজছো?

উপায়ান্তর না দেখে সত্যি কথাটাই তাকে বললাম। সৎ মায়ের জ্বালাতনে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছি। নিয়ে গেলো তাদের বাড়ি। মা মায়ামায়া দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। একটা আপাতত আশ্রয় পেয়ে জল এলো আমার চোখে। মায়ের যেমন হয়, বেচারী জলদি নাস্তা এনে দিলেন। ছেলেটা আরো অনেক কিছু জানতে চাইলো। কিন্তু মা বললেন; এখন এতো জেরা করো নাতো। একটু ঘুমোতে দাও ছেলেটাকে। বসার ঘরের চৌকিতে লম্বা হয়ে গেলাম।

সৎমায়ের অত্যাচার থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়; লেখাপড়াটা ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়া। পরের দিন পাড়ার সব ছেলে চাঁদা তুলে শ দেড়েক টাকা হাতে ধরিয়ে তুলে দিলো ঢাকার ট্রেনে। গফরগাঁও বা তার পরের ষ্টেশনে ঢাকার একটা টিকিট কিনে নিলেই চলবে বলে জানালো অভিজ্ঞ রেলযাত্রী ছেলেটা। বিচিত্রা টিকেটে বিনে পয়সায় ভ্রমণের কথাটা বললাম না ওদেরকে।

ট্রেন থেকে নেমে অতি চালাকি করতে গিয়েই ঘটল বিপদটা। বিনা টিকেটে ভ্রমণের আনন্দে আত্মহারা হয়েই বোকার মতো দিয়েছিলাম লাফটা। একটা পুরো ট্রেনের যাত্রী বোঝাই জাহাজের পেটে। তাঁরা সব নামলে আরেকটা ট্রেনের যাত্রী উঠবে। এ পথে যারা বারবার যায়, তাঁরা সব কিছু চেনে-জানে নিজের উঠোনের মতো। এই সবজান্তা যাত্রীরা জাহাজ নোঙ্গর করার আগেই শুরু করে উঠা-নামা। জেটির সাথে ঝুলানো টায়ারগুলোর সাথে জাহাজ ধাক্কা লাগার আগেই শুরু হয় সব কিছু চেনা-জানা যাত্রীদের উঠা-নামা। রাত দুপুর। জাহাজের সারেং কেবিন থেকে আলোটা ফেলেছে জেটিতে। এই চালাকিটা বুঝে উঠতে না উঠতেই হাত তিনেক পিছিয়ে গেছে জাহাজ জেটির সাথে ধাক্কা লেগে। এবার লাফ না দিলে হেলায় হাত ছাড়া হয়ে যাবে সুযোগটা। ডান পা-টা জায়গা মতো পড়ার পরেও থোতাটা কিসের সাথে যেনো ধাক্কা খেলো। উপর থেকে নীচের দিকে ঝুলানো কাঁচের দেয়ালটা লাফ দেয়ার আগে দেখি নি। মাথায় ঝাকুনী লাগায় কখন পানিতে পড়ে গেলাম টের পাই নি। এর মধ্যে ধীরে ধীরে জাহাজটা এগিয়ে আসছে জেটির দিকে। ডানে বামে সাঁতরে জেটির সাথে জাহাজ ভেরার আগেই এই চিপা থেকে বের হতে পারবো এমন আত্ম বিশ্বাস হলো না।

পানি থেকে জাহাজ বা জেটির উচ্চতা প্রায় এক পুরুষ। পায়ের নীচে মাটি থাকলেও উচ্চলম্ফে এতো উঁচুতে উঠতে পারতাম না। কিন্তু এই মৃত্যুগহ্বর থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায় উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা। শরীরের সমস্ত শক্তি এক সাথে করে মরার আগে একটা শেষ চেষ্টা হিসাবে পা পানিতে ঠেকিয়েই লাফের মতো একটা কিছু করে ডান হাতটা জাহাজের কার্ণিশে ঠেকিয়ে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলাম কোন সাহায্যের আশায় উপড়ের দিকে। এমন শক্ত করে কে ধরলো! মনে হচ্ছিলো হাতের হাড্ডি মাংস কিমা হয়ে যাবে। প্রথম জনের পরেই আরো কয়েক জন মিলে জেটির সাথে জাহাজ ভীড়ার আগেই আমাকে টেনে তুলতে গিয়ে হাতের এই অবস্থা।

একটা প্যান্ট আর একটা টালের সাদা শর্টের সাথে পায়ে ছিলো বাটার ট্রপিক্যাল স্পঞ্জের স্যান্ডেল। থুতনীর নীচের কাটা জায়গাটা থেকে রক্ত ঝরে লাল হয়ে গেছে শার্ট। জখম যেমনই হোক, ভেজা সাদা শার্ট লাল হয়ে নিশ্চই খুব ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিলো। ঠক ঠক করে কাঁপছি শীত এবং যমের সাথে লড়াই করে। ধরাধরি করে নিতে হবে এমন খারাপ না অবস্থা। কিন্তু অন্যের ঘাড়ে চেপে যাওয়ার এই সুযোগটা হাত ছাড়া করে লাভ কী! কেবিনের পাশের রান্না ঘরে একেবারে জলন্ত

চুলোর পাশে এনে বসানে হলো আমাকে।

সাথে কিছুই ছিল না। কিন্তু এখন সব দোষ দুর্ঘটনার। টাকা-পয়সা কাপড়-চোপড় সব পানিতে ফেলে জান-টাই রক্ষা করতে পেরেছি কেবল। কাজেই এখন টিকেটের কথা কেউ জানতে চাইবে না। জাহাজে বাকী পথটা পাড়ি দিয়েছি প্রথম শ্রেণীতে বসেই। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে বলাবলি কথায় বুঝলাম; আমি একটা দ্বিতীয় জীবন পেয়েছি। গত সপ্তায় এই চিপায় পড়ে কোন একজন উঠতে পারেন নি।

এর মধ্যে টয়লেটে গিয়ে দেখে এলাম, দিনাজপুর থেকে পাওয়া টাকাটা নোটবুকে আছে। শ'পাঁচেক হয়ে গেলো সব মিলিয়ে। হোক রাজাকারের কলেজ নামতো শহীদ নজরুল সেখান থেকেই পরীক্ষাটা দেবো। খুনী মুশতাকের কলেজে যাব না। এই সিদ্ধান্ত পাকা করেই কমলাপুর নামলাম।

সচল নামঃ পুতুল
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/doll

কলেজ নিয়ে লিখতে গেলে আসলে অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। সেগুলোকে ঠিকমত সাজিয়ে লেখা আকারে বের করা আমার মতে খুবই কষ্টসাধ্য কাজ বলে মনে হয়। তবুও সে কাজটি করার লোভ সামলাতে পারলাম না। মনে হল, দেখি-ই না চেষ্টা করে পারি কি না!

কলেজ সম্বন্ধে প্রথমেই মনে পড়ে ভর্তি পরীক্ষার কথা। আমি জীবনের প্রথম নটরডেম কলেজে যাই ভর্তি পরীক্ষা দিতে, ফরম বন্ধুরা কিনে এনেছিল। আমরা পাঁচজন বন্ধু একসাথে পরীক্ষা দিতে যাই। ফরমতো কিনে ছিল ওরা সিরিয়াল অনুসারে কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখি পাঁচজন পাঁচ জায়গায়। শুরুতেই বুঝে গেলাম, নটরডেম কি চীজ!

ভর্তি পরীক্ষা এত বাজে দিয়েছিলাম যে, পরীক্ষা শেষ করেই আমরা ছুটলাম বি.এফ.শাহীন কলেজের ফরম কিনতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেখানে পরীক্ষার দিন ছিল যেদিন নটরডেমের রেজাল্ট দিবে। তো সেদিন সকালে পত্রিকা কিনে এনে দেখি চান্স পেয়ে গেছি, আমিতো খুশিতে বাকবাকুম। কিন্তু আমার বেশিরভাগ বন্ধুরই নটরডেমে হয়নি আমি তখন ওদের সাথে গেলাম বি.এফ.শাহীনে পরীক্ষা দিতে (জনদরদী আর কি)। পরীক্ষা দিতে গিয়েতো পাশের, পেছনের বন্ধুদের সমানে দেখাচ্ছি, কয়েকবার পরীক্ষক সতর্কও করল। কিন্তু আমি কি আর তখন এসবে ডরাই??!! আমার এক বন্ধুতো (নটরডেমে চান্স পাওয়া) ওকে উঠে অন্য জায়গায় বসতে বলছিল দেখে খাতা পরীক্ষকের সামনে ছিঁড়ে বের হয়ে এসেছিল।

নটরডেমে রোলনাম্বার না দেয়া পর্যন্ত সীট নিদিষ্ট করা থাকে না। প্রথম দিকে আমার সাথে যে ছেলেটা বসেছিল, তাকে আমি বুয়েটেও পাইছি (নিজের বিভাগে না) এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে সে আমার স্ত্রীর খালাত ভাই (দুনিয়াটা খুবই ছোট জায়গা)।

নটরডেমে আমি অবশ্য খুবই ভদ্রগোছের ছেলে ছিলাম(?), তেমন একটা বাদঁরামী করতাম না। আমাদের প্রথম বর্ষে ক্লাস টীচার ছিল, এসি দাশ স্যার, যার নীতি ছিল উনি ক্লাসে ঢুকার পরে দরজা বন্ধ এবং সেটা কেউ নকও করতে পারবে না। আমি অবশ্য সেটা জানতাম না প্রথমে। একদিন দেরি করে এসে দেখি, দরজা বন্ধ, আমি ভালো মনে (!) নক করেছি। আর যায় কোথা!

স্কুলে থাকতে স্কাউটিং করার কারণে কলেজে প্রথমে স্কাউট ক্লাবটা খুঁজার চেষ্টা করেছিলাম। খুঁজে না পেয়ে যোগ দিলাম ন্যাচার স্টাডি ক্লাবে যার মডারেটর ছিল মিজানুর রহমান ভুঁইয়া স্যার। উনি টীচার হিসেবে যেমন মজার ছিলেন তেমনি মানুষ হিসেবেও ভাল ছিলেন। ক্লাসে অবশ্য উনার পড়ানোর চেয়ে গল্প করার দিকেই আগ্রহ ছিল বেশী। উনার ক্লাস ছিল টিফিন পিরিয়ডের আগে এজন্য প্রায়ই আমাদের টিফিনে যেতে দেরী হয়ে যেত কেননা ক্লাস শেষ হবার ১০ মিনিট আগে উনার মনে হতো টাকাটা হালাল করতে হবে আর তখন শুরু হতো উনার পড়ানো ন্যাচার স্টাডি ক্লাবের হয়ে অনেক মজার স্মৃতি আছে কতবার যে তখন বোটানিক্যাল গার্ডেন, বলদা গার্ডেনে গিয়েছিলাম (পাখি আর গাছের ছবি তুলতে)তার ইয়াত্তা নেই। একবার গাজীপুরের একটা গ্রামেও গিয়েছিলাম।তখন অনেক গাছের আর পাখির নাম শুনেছিলাম যার বেশিরভাগই এখন আর মনে নেই।

নটরডেমে পড়ছে আর প্র্যাক্টিকাল ক্লাসের কথা তার মনে নেই এরকম ছাত্র মনে হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথমদিন ফিজিক্স প্র্যাক্টিকালে আমার এক্সপেরিমেন্ট ছিল, অভিকর্ষ ত্বরনের মান নির্ণয় আর প্রথমদিনেই পেলাম রিপিট (g এর মান ১০ এর বেশি আসছিল)। রিপিট অবশ্য এর পরেও ২-১ বার পেয়েছি কিন্তু কোনটাই প্রথমটার মত শকিং ছিল না।

কলেজে যে কজন টীচারকে ভালো লাগতো তার মধ্যে জওহরলাল স্যার, সুশান্ত স্যার, বিদ্যাসাগর স্যার (স্যারের হাতের কারুকাজ ছিল দেখার মত সেটা যারা উনার ক্লাস না করছেন তাদের বুঝানো সম্ভব না), আর টেরেন্স পিনেরো অন্যতম। মুখতার স্যাররেও অবশ্য ভালা পাইতাম (তবে সেটা অন্য কারণে), আর জাইঙ্গাতো ছিল পুরাই জোকার, অ্যাম্পিয়েন্ট ম্যারিনার আর গিফট অফ ম্যাজাই (আমরা অবশ্য অন্য কিছু পড়তাম) পড়ানোর সময় ও যে কি লাফালাফি করতো, বলার মত না। আরেকটা স্যারও বেশ মজার ছিল সেটা হচ্ছে সুহেল স্যার। আমিতো একদিন আরেকটু হলে মাইরই খাইতাম, ক্যামনে জানি বাইচ্যা গেছিলাম (রাখে আল্লাহ মারে কে)। আরেকজনের কথা না বললে অসম্পুর্ন থেকে যাবে, সে হচ্ছে দাঁতভাঙ্গা পাগলা ইউনুস। আমাদের ফিজিক্স পড়াতো। আমরা শুনছিলাম উনার ফ্যামিলির সবাই

জিনিয়াস। উনার কথা মোটামুটি ক্লাসের কেউই বুঝতো না কারণ উনার দাঁতের ফাঁকা দিয়ে অর্ধেক কথাই বের হয়ে যেত।

একদিন পড়াচ্ছেন, হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই দেখি আমার বেঞ্চের দিকে আসতেছে। আমিতো তাড়াতাড়ি মাসুদ রানাটা (তখন ওটাই পড়ছিলাম) ঠেলে রাখার চেষ্টা করছি, দেখি উনি আমাকে ছাড়িয়ে একদম শেষ বেঞ্চে গিয়ে একজনকে ধরে দুমদাম কিলানো শুরু করলেন, তারপর তার বইটা ছিড়ে টুকরা টুকরা করলেন, এরপর বেশ ভালো মানুষের মত আবার গিয়ে পড়ানো শুরু করলেন। বেচারা তখন প্রাক্টিকাল লিখছিল। পুরা ক্লাসতো পুরা তব্দা খেয়ে গেছিল। সবচেয়ে বেশি ভয় মনে হয় আমি পাইছিলাম। পরে শুনি যে, আরো কয়েকজনও আমার মতই ভয় পাইছিল।

কলেজ লাইফে আমার তেমন কোন বন্ধু হয়নি। এর একটা কারণ মনে হয় আমার গ্রুপে বেশিরভাগই ছিল আইডিয়াল স্কুলের, ওদের নিজেদেরই বিশাল গ্রুপ, আমি আর সেখানে জায়গা করে নিতে পারিনি, চাইওনি বোধ হয়। আমার সাথে ক্লাসে যে বসতো ও কুইজে সবসময় আমার পেছেন বসতো, তো ওকে আমি মোটামুটি সবসময়ই দেখাতাম। ওর সাথেই কিছুটা বন্ধুত্ব ছিল। প্রথম বর্ষ যেমন তেমন ভাবে কাটলেও সেকেন্ড ইয়ারে আমরা আর সময় নষ্ট করিনি ক্লাস করে মোটামুটি প্রতি সপ্তাহেই (প্রতি সপ্তাহে না হলেও মাসে ২বার অন্তত) আমরা মধুমিতায় যেতাম সিনেমা দেখতে। মাঝে মাঝে ভিন্ন স্বাদের(!) জন্য সাইবার ক্যাফেতেও গেছি এজন্যই সেকেন্ড ইয়ারে উপস্থিতির হার বিপদসীমার খুব কাছে চলে গিয়েছিল।

লিখবোনা লিখবোনা করেও অনেক কিছু লিখে ফেললাম, তারপরেও কতকিছুই না-বলা থাকলো। শেষ করবো একটা ঘটনা বলেঃ

আমরাই মনে একমাত্র ব্যাচ যাদের ক্লাস আগে শেষ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল নটরডেম কর্তৃপক্ষ। আমাদের সময়ই ফাদার (!) বিমলের কান্ডকারখানা (যারা নটরডেমে পড়ছেন তারা আশা করি এটা জানেন) ফাঁস হয়ে যায়। আর আমরা প্রতিদিন টিফিন আর ক্লাস শেষে "বিমল, বিমল" স্লোগান দিতে দিতে নামতাম। শেষমেষ আর না পেরে, আমাদের ক্লাসই সাসপেন্ড করে দেয় কলেজ।

সচল নামঃ পাগল মন
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/guest_writer

চিকিৎসা বিভ্রাট

...কৌস্তুভ অধিকারী

কলকেতার কলেজে আমাদের পরশুরাম-রচিত চিকিৎসা সঙ্কট নাটক করার গল্প নিয়ে লিখছি, আমাদের পরিচালক বন্ধুর জবানীতে। চিকিৎসা সঙ্কট যেমন হয়েছিল, তাকে চিকিৎসা বিভ্রাট বলাই উচিৎ; কলাকুশলীরা ভুল করে প্রায়ই বলতও, তা যে এমন ফলে যাবে ভাবিনি।

০১

নমস্কার। আমি একজন ছাত্র। কলেজে পড়ি। হস্টেলে থাকি না যদিও, তবুও প্রায়ই যাই। হয় খ্যাঁট থাকলে, নয়ত ডাউনলোড করা কোন সিনেমা নেবার হলে। বন্ধুরা বলে, আমার রুচি নাকি খুব খারাপ, শুধু আলফাল আপনা সপনা মানি মানি মার্কা ফিলিম ছাড়া আর কিছু দেখি না। কি করব বলুন, সব জিনিস তো সবার ধাতে সয় না। যে ক্লাসিকাল সঙ্গীত শুনলে মনে হয় কেউ কায়দা করে গার্গল করছে, তা শুনে কেন ভাল লাগবে বলুন দিকি।

যাক সে, এটা কিন্তু ঠিক যে আমি ভাল অভিনেতা। বিষেশত হিরো। (ওহ্, বানান দেখে চমকে উঠলেন বুঝি? ও আমার একটু-আধটু অমন হয়ে যায়।) অবশ্য দেবানন্দ মার্কা নয়, ঋত্বিক রোশন মার্কা। যদিও দেবানন্দ শাহরুখ অমিতাভ সকলের ভালই নকল নামাই। কবে থেকে শখ, নিজে পরিচালক হয়ে এমন একটা সিনেমা বানাবো, নিজের হিরোত্ব পুরো উজাড় করে সবার চোখ ধাঁধিয়ে দেব। অন্যের শাসনে থেকে অভিনয়ে সুখ নেই। একটু মনপসন্দ কায়দা-কেতা (নিন্দুকে বলে ছ্যাবলামো) করা যায় না। তাই এবার হস্টেলের নাটকের অনুষ্ঠান স্পটলাইট-এর কথা শুনতেই মনে হল, এ-ই সেই, শেষ সুযোগ। ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, আর তো হবে না। ঠিক করলাম, যত বড় বড় হিরো আছে দুনিয়ার, সবার থেকে নিয়ে একটা কিছু নামাতে হবে। ডন, কৃশ, সুপারম্যান, শোলে, হ্যারি পটার, গোলমাল, মুন্নাভাই, এইরকম সব মিলিয়ে।

শুনে বন্ধুরা অনেক হ্যাটা দিল। বলিস্ এখন বার্ড ফ্লুর এত ছড়াছড়ি, কেউ দয়া করে (পচা) ডিম ছুঁড়বেন না; "একটা ডালির ব্যবস্থা করিস, পুজোর অঞ্জলির মত, যারা যারা জুতো ছুঁড়তে চাইবে তারা যেন আলাদা করে না ছুঁড়ে ঝামেলা না বানায়, ডালি সবার কাছে যাবে, তাতে দিয়ে দেয়, আমরা ছুঁড়ে দেব, "অনুরোধ করিস, কেউ একপাটি ছুঁড়বেন না, আপনাদেরও লাভ হয় না, আমাদেরও না, দিলে দুপাটি-ই দেবেন এইসব। আরে, তোরা কি এসবের মর্ম বুঝবি? তাহলে তো তোরাই হিরো হয়ে যেতি রে। রোজ রাত্রে যে তিনটে করে আমেরিকান পাই দেখে ছটায় শুতে গেছি, সে কি আর এমনি এমনি? ফিল্ম অ্যাওয়ারনেস নইলে আসবে কি করে?

০২

"খোশনবীসপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরম্ভা ... – তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ, আর নায়ক একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হতোস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। ... শেষে একটি গীতও দিয়াছেন নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।*(১)

আমার অবস্থাও ঠিক এরকম হল আইডিয়া কিছুতেই প্লটে কনভার্ট হল না। তাই দেখে কৌশিক, আমার ক্লাসমেট, একদিন ঐটা পড়ে শোনাল, যে দ্যাখ জগু, দিন তো এসে গেল, এখনো এইভাবে বসে থাকলে শেষে কিছুই নামবে না। আরেক বন্ধু ধনঞ্জয়ও তাই বলল। শেষে দেখি, যা ভয় করেছিলাম তাই, এরা দুজনে সব পুরনো বাংলা গল্প-নাটক নিয়ে বসে পড়েছে। একটা করে বলে, একটু করে অ্যাক্টো করে, আর আমাকে জিজ্ঞেস করে। আমি কি বুঝবো? আমার কাছে তো সব পুরোনো জিনিসই পচা।

এটা অনেকেই বলেছিল, আমিও চেয়েছিলাম, যে কমেডি হোক, লোকে মজাও বেশি পাবে, আর সিরিয়াস অ্যাক্টিং আমাদের দিয়ে হবেও না কারন আমার পণ ছিল যারা কোনদিন আগের হোস্টেল নাটকগুলোয় নামেনি তাদের দিয়েই করাব যদিও মহত্ব দেখাচ্ছিলাম তবুও আসল কারন এই যে ভাল অ্যাক্টররা আমায় বিশেষ কলকে দিত না। শেষ মেশ মনোজ মিত্রের একটা লেখা, ভীম বধ, আর চিকিৎসা সঙ্কট এর মধ্যে আমি পসন্দ করলাম লাস্টেরটা। আমার সাজানো পেল্যান শুকিয়ে গেল, কিন্তু কি আর করা।

০৩

ভেবেছিলাম হিরোর রোলটা নেবো, তবে পরিচালনার সঙ্গে মেন রোল করা একটু চাপ বলে, আর একটু ভদ্রতা/সঙ্কোচ বশত, একটু বিনয় করছিলাম। ওমা, দেখি তক্ষুনি ধনা আমাদের ব্যাচের অন্য একজনকে কাস্ট করে দিল! আমার ভাগ্যে জুটল শুধু ষষ্ঠীবুড়োর রোল। কৌশিক পাজিটাকে মধু চাকরের রোলে দিয়ে অবশ্য একটু মনের জ্বালা মেটালাম। চাকরের রোল কেউ করতে চায় না গত দুবার নাটকে (যখন আমি দর্শক) যে-ই চাকরের রোল পেয়েছে, শেষ দিন বাড়ি পালিয়ে গিয়ে অন্যদের সমস্যায় ফেলেছে। অবশ্য এবার ও এমন ভাবে জড়িয়ে ছিল যে পালাতে পারবে না, এই আশায় ছিলাম। পালায়ও নি।

আমাদের ব্যাচের মেয়েগুলো কেউ রাজি হল না। শেষে হস্টেলাররাই একজন রিসার্চ ফেলো দিদি (বিপুলা), আর একজন অন্য ব্যাচের মেয়ে (পিসিমা) কে ধরে আনল। দ্বিতীয় জনের অভিনয় স্ক্রিপ্ট রিডিং এর থেকে বেশি আর ওঠে না। কি চাপ। অন্য কাস্টিং মোটামুটি হয়ে গেল। তার পর হল মহা ঝামেলা। বঙ্কু পয়লা বৈশাখ এর জন্য একহপ্তা মামাবাড়ি যাবে, নো প্রাক্টিস, পদত্যাগ। নিধু মুম্বাই তে চাকরির ইন্টারভিউ খারাপ দিয়ে, মনের দুঃখে রোল করবে না বলে বাড়ি চলে গেল। পিসিমা র ঘরে জানলা দিয়ে চুরি হলে সেও বাড়ি পালাল। নন্দ মেন রোল, সেও বন্ধুদের প্যাঁক খেয়ে রিজাইন করল। তাকে রিপ্লেস করা গেল, কিন্তু নতুন ছেলেটি সেই শান্ত ভীরু ভাবটা আনতেই পারে না। চ্যাংড়ামো এসে যায়। নন্দ মেলে না, পিসিমাও না। এদিকে পুরনো দিনের গল্পের সাথে মেলানো পুরোন মেজাজ, হাবভাব আনতে পারি না, ডিরেকশন দেব কি? লোকজন বলল, এরকম তো হবেই। সবাই নতুন অ্যাক্টর, অভিজ্ঞতা নেই, দক্ষতা নেই, সাহস ও নেই। আর ওদিকে কৌশিক আর ধনঞ্জয় বড় পারফেকশনিস্ট, খুব খুঁতখুঁত করে। মনের দুঃখে বললাম:

আমার স্ক্রিপ্ট না নামিল,
ট্রেনিংও ঝুলিল,
দিন যে আসিয়া যায় মা।
স্পটলাইটেতে কি যে নামাব
বুঝতে পারিনা হায় মা।
ধনা-টার চাপে স্টোরি তো ভুলেছি,
রোলটাও বড় বিশ্রী পেয়েছি;
কৌ পাজি করে বড় সর্দারি,
আর না সহ্য হয় মা।
কাস্টিঙে দেখি ঝামেলা তো ভারি,
সেট, মেকাপেও বড় বাড়াবাড়ি;
একটু ঢোকাতে চাই ছ্যাবলামো,
সেই সুযোগও না পাই মা।
ছেলেগুলো অ্যাক্টিং তো জানেনা
ডায়লগও মনে রাখতে পারেনা
যেথা নেই পচা ডিম বা টমেটো
সেথা যেতে প্রাণ চায় মা।

০৪

হাকিমের আলখাল্লা জোগাড় করতে গেলাম কলেজের অফিসে, সমাবর্তন (বাপরে, কি কঠিন শব্দ, সোজা বাংলা হল কনভোকেশন) -এর জোব্বা চাইতে। শুনলাম, সদ্য কাচতে দেওয়া হয়েছে, মেরামত হবে, তবে আসবে। আমাদের পাঁশুটে মুখ দেখে ওরাই বলল, বিদেশি স্টুডেন্টদের অফিসে যাও, ওদেরও একসেট থাকে। গেলাম, চাইলাম। বলল, কি করবে? যেই শুনল, হাকিমের পোষাক, আমায় বকে দিল। না, হাকিমের জন্য কেউ রংচঙে ড্রেস দেয়? কালো কোট চাই। তখুনি এক জন উকিল বন্ধুকে ফোন করে তার কাছ থেকে চাইল, বলল পরের দিন এসে নিয়ে যেও। কৌশিক শুনে পরে বলে কি, ওটা ওরা বিচারক হাকিম ভেবেছে, চিকিৎসক হাকিম নয়। কি গেরো! এই জন্যেই এইসব পুরোনো জিনিস করতে চাই না। যাহোক, গিয়ে আবার বললাম, এবার ঠিক করে।

লোকজন মনের সুখে বান্ধবী, বাড়ি সবেতে সময় দেয়, কিন্তু রিহার্সালে ফাঁকি। অরিজিৎ আগে মুখে না না করছিল, কিন্তু এত লোক, এত মেয়ে দেখে শেষে একটু ছদ্ম গাঁইগুঁই করে বন্ধু করতে রাজি হয়ে গেল। ওদিকে দিন এসে গেল। বিপুলাদি এক দিদি কে ধরে এনেছিল, সে বলল ইমেলে স্ক্রিপ্ট পাঠাতে। টেনশনে ভুল করে আমি অমিতার বদলে অনিতা লিখে মেল করে দিয়েছি। পিসিমা আগের দিন বিকেলে ফোন করে বলল, কিরে, আমায় লাগবে না তো? তখন রহস্য উদঘাটন হল। ভাগ্যিস পিসিমা দারুন অ্যাক্টর, তাই বেঁচে গেলাম। কিন্তু রাত হয়ে যাওয়ায় মধুর সঙ্গে তার কোন রিহার্সালই হল না। এ নিয়ে পরে মুশকিল হয়েছিল, পরে বলব।

০৫

আগের দিনও নিধু পাই না, হকার পাই না। হকার লাগবে, কারন, ট্রাম থেকে পড়া তো আর দেখাতে পারি না, পড়ার যুতসই কারন চাই। কৌশিক বলল, একটা মাতাল রাখিস, নন্দ পড়ে গেলে মাতালই বলবে, এ ব্যাটা মাতাল। আর আমি ভেবেছিলাম, স্টেজে সাইকেল তুলব, চালক কেতরে কেতরে যাবে ওটায় চড়ে। তারপর হকার, নন্দ, মাতাল, সাইকেল একসাথে ধাক্কা। টিপিক্যাল হেরা ফেরি প্লট। অনেকে বারন করল। বলল, এরম কর, নন্দ বন্ধুকে ডাকতে গিয়ে হকারের মাল পাড়িয়ে দেবে, সে ঠেলে দেবে, তখন মাতালের সাথে ধাক্কা হবে। মনোকষ্টে রাজি হলাম। আমি যেন ডাইরেক্টরই নই, যে যা পাচ্ছে মত চালাচ্ছে। আরে, হস্টেলের ছেলেরা কি পছন্দ করে আমি জানি, ওখান থেকেই তো আমেরিকান পাই পাই। শুনল না, বলে এই বয়সে আর স্ল্যাপস্টিক কমেডি করতে ইচ্ছা করে না। সেটা কি, কে জানে।

লোকেদের চাপে শেষ দিন সকালে আমাদের ব্যাচের বাঘ অ্যাক্টরদের ধরতেই হল। রাজিও হয়ে গেল। নিধে আর হকার। নিধের একটা গান লেখা হয়েছিল। বেজিং থেকে সেটা লিখে পাঠিয়েছিলেন লন্ডনবাসী এক দাদা যাঁর আগে দিল্লিতে ব্যাণ্ড ছিল। সেটা নিধে একটু অন্য সুরে, অল্প কথা বদলে খাসা তুলে ফেলল।

০৬

গল্পের শেষ দিকে নন্দ বিপুলা মল্লিকের চেম্বারে যাবে, তারপর দুজনের দুজনকে পছন্দ হবে, তারপর বিয়ে; তবে আড্ডাটা উঠে যাবে। বিয়ে দেখানো ঝামেলা বলে স্ক্রিপ্টে ঠিক হল, প্রথমবার নন্দ উঠে আসার পর সফট্ লাইট হবে, বার দুয়েক নন্দ যাতায়াত করবে, শেষে দুজনে হাত ধরবে, আর সানাই বেজে উঠবে। লাস্ট সিনে লোকজন খেয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলবে, আমাদের আড্ডাটা ঘুচল।

বিপুলাদি দারুন অভিনয় করে, তায় আবার এ বিষয়ে জ্ঞানও আছে বলল, এক কাজ কর, প্রথমবার নন্দ হাতে প্রেসক্রিপশন নিয়ে যাবে, আর ফেরত দিয়ে দেবে, কারন বিপুলাকে দেখেই তো সব অসুখ চলে গেছে। আর দ্বিতীয়বার গোলাপ নিয়ে যাবে, গোলাপের উপর দুজনে হাত ধরবে। খাসা প্ল্যান। আবার একটা গানও বলল, যার দুটো লাইন দুবার যাতায়াতের জন্য খুব উপযুক্ত:

"কেটেছে একেলা বিরহের বেলা, আকাশ কুসুম চয়নে,

সব পথ এসে মিলে গেল শেষে, তোমারি দুখানি নয়নে।

গান চালিয়ে সেই অনুযায়ী অভিনয়ের সময় মেলানো করা হল। আমি কৌশিককে বললাম, গানটা আর সানাইটা জুড়ে দে, ল্যাপু অপারেটর যদি পরপর প্লে করতে না পারে। গাঁইগুঁই করছিল, তবু করে দিল। লাল গোলাপ কিনে আনা হয়েছিল, দিব্যি প্রাকটিস হল, কিন্তু কয়েক ঘন্টা পর স্টেজে নামতে গিয়ে দেখি সে গোলাপ নেতিয়ে গেছে, জলে রাখা হয়নি বলে। যাচ্চলো ওটা ছাড়াই করা স্থির হল।

০৭

আমি আর কৌশিক হাকিম, মীরমুন্সী, বল্‌বর আর নন্দকে প্র্যাকটিস করিয়ে খেতে গেছিলাম। এসে দেখি ওরা সিন চেঞ্জ করে ফেলেছে! নন্দ সেই সঙ্কুচিত ভাবে রোগটা কি, সেটা জানতেই তো আসা বাপু ছেড়ে উদ্ধত রাগত বিরক্ত ভাবে বলছে, "আরে, রোগটা জানলে কি এখানে আসতাম নাকি?" হাকিমও, নন্দ বন্দেগি জনাব বলার বা নজরানা দেবার আগেই খামোশ বলে চিৎকার করে উঠছে। শেষে মাথা কামাবার বদলে সবাই নন্দকে ধরে ঠ্যাঙ্গাচ্ছে; নন্দ বলছে, "ছেড়ে দাও, বল কত টাকা চাও; এর মাঝে মীরমুন্সী আবার ষষ্ঠীবুড়োর লাঠিটা বাগিয়েছে, তাই দিয়ে নন্দর ঠ্যাং টানা হচ্ছে। কৌশিক দেখেশুনে বেশ খেপে গেল। আমায় বলছে, ডাইরেক্টর, কিছু বলো এদের। কি বলব, আমার তো বেশ মজাই লাগছে, এত দিন যে ভাটের আশায় ছিলাম, প্রথমবার তা দেখতে পাচ্ছি। আবার কৌশিকের ভয়ে

বলতেও পারছি না, যে এটাই হোক। সে-ই অনেক ঝগড়া করে ওই পরিবর্তিত সিন বাদ দেওয়ালো। আমরা পাঁচ জনেই বেশ দুঃখিত হলাম। হাকিম তো গোড়া থেকেই বলছিল, "কুছ্ অরিজিনালটি লাও ইয়ার। উও ভুলভুলাইয়া জ্যায়সা স্যাফ্রন পহ্না রোল দো মেরা। তাতেও কৌশিকের আপত্তি অন্য একটা সিনেমা থেকে ডিরেক্টলি একটা রোল কপি করে আনা কি করে অরিজিনালটি হবে?"

তবে তার জমকালো প্রপ্স্ টুপি, লাল ভেলভেটের আলখাল্লা, সাদা-লাল-নীল তিনরঙা দাড়ি, তারা কাটা পেতলের আতরদান, আর চমকদার গড়গড়া দেখে হাকিম খুশি হয়ে শেষমেশ রাজি হয়ে গেল।

০৮

হকার তার প্রথম রিহার্সাল দিতে আসে এক নাটকের এক ঘন্টা আগে। তখন খবর শুনে আক্কেল গুড়ুম আমাদের দ্বিতীয় মাড়োয়ারী তখনও বাড়ী থেকে বেরোয়নি আর সে না এলে নন্দপতন সিনে ডায়লগের ফ্লো ঘেঁটে যাচ্ছে। তবুও তার মধ্যেই শুধু পড়াটুকু প্র্যাকটিস হল। হকার রিহার্সাল দিতে বসেছিল জুতোর ঢিপির পাশে, তাই ঠিক হল সে জুতোই বেচবে। রিহার্সাল হয়ে গেল, এরপর স্টেজে উঠে হল মুশকিল। দ্বিতীয় মাড়োয়ারী এসেছে নাটক শুরুর ঠিক আগে। এসে ব্যাপারটা মোটামুটি শুনে নিয়েই স্টেজে উঠে গেছে। সেখানে হকারের সঙ্গে বড় আলোচনা জুড়ে দিয়েছে কোন জুতো কেমন, সস্তা কত, নতুন না সেকেন্ডহ্যান্ড এসব। হকারেরও খেয়াল নেই, কথা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে নন্দ বিছানো জুতোর উপর উঠে পড়েছে, হকার আর ক্রেতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে; একবার অডিয়েন্স, একবার হকার, একবার মাতাল, আর একবার আমার দিকে চায়; কিন্তু হকার আর ঠেলা দেয় না, বেচায় ভীষন ব্যস্ত। আমরা ইশারা করছি, ওরে ঠেল, ঠেল, হকার শোনে না। মাতাল খানিক দূরে দাঁড়িয়ে লটরচটর করছে, নন্দ ঠেলা খেলেই তো সে ছুটে আসবে ধাক্কা দিতে, নইলে পড়বে কেন। এমন সময় হঠাৎ হকারের হুঁশ হলে, "এই, হ্যাঁ, সরে যান, বলে ঠেলে দিল। মাতাল তাড়াতাড়ি ছুটে আসতে গেল, পুরোটা পারল না, নন্দ খানিকটা এমনি এমনি গোঁজামিল দিয়ে পড়ে গেল।

এমন চমৎকার উদ্বোধনের ধারা বোধহয় পরের সিনেও কন্টিনিউ করছিল। চিত্রশিল্পী (বন্ধুর বাবা)-র পরামর্শ অনুযায়ী নন্দর বাবার পোর্ট্রেট লাগানো হয়েছিল পিন দিয়ে, পেছনের কাপড়ে। লাগাতে না লাগাতেই হাওয়ায় ঠপাস করে খুলে পড়ে গেল। ভাগ্যিস তখনো আলো জ্বলেনি। সেলোটেপ দিয়ে লাগানো হল (আর্ট ডিরেক্টরের নাকি কাঁচি হাপিস, দাঁত দিয়ে কাটতে হল)। এরপর, সিনে, পিসিমা কাশী টেনে নাও ঠাকুর বলে পিছন ফিরেছে, মধু এসে ডেকেছে, "পিসিমা, চিনি চাই। কৌশিক নাকি স্ক্রিপ্ট হারিয়ে ফেলায় পিসিমার কোন ডায়লগের পর উঠবে ধরতে পারেনি, ভুল সময়ে উঠে পড়ে থতমত খেয়ে গেছিল, সুন্দর কন্টিনিউ করা লাইন ঠাকুর চিনি চাইছে পিসিমা না বলে ওটা বলে ফেলেছে। ছোঁড়া আরও ভেবলে গেল, যখন দেখে পিসিমা ফিরে ডায়লগ বলছে না। আবার চেঁচাল, "পিসিমা, তবুও সাড়া পায় না। তখন নাকি লাইন চেঞ্জ করে বলতে যাচ্ছিল, "পিসিমা, অনেক তো বয়স হল, এবার কানের যন্তর কিনুন। তারপর পিসিমাকে ফিরতে দেখে চেপে গিয়ে আসল ডায়লগ বলেছে।

নন্দরা গোপনে পরামর্শ করেছিল, কিছু অরিজিনালিটি ওরা ঢোকাবে অনস্টেজ, যেমন মধুকে হ্যাটা দেওয়া ইত্যাদি। শুরু থেকেই এমন কীর্তি হতে থাকায় আর পারে নি।

০৯

কবরেজের রোলে বাঙাল উচ্চারন দরকার ছিল। কিন্তু হস্টেলের একমাত্র বাঙাল বেটা রোল করতে হবে শুনেই বাড়ি পালিয়ে গেল। কোবরেজ যে করছিল সে পাক্কা ঘটি। তার উচ্চারন অনেক কষ্টে কিছু দুরুস্ত্ হলেও অভিনয় ভালো ছিল না। আর দেখ দেখ বিড়েলে সবটা ছাগলাদ্য ঘৃত খেয়ে গেল এর বদলে খালি দেখ দেখ ছাগলে সবটা... উম... ইস্... বিড়াল করছিল। স্টেজে যদিও তা করে নি, তবে দৌড়ালো ঠিক উল্টো দিকে।

আসল মজা জমল, আর আমরা মজলাম, হাকিম এর সিনে। সিন করতে গিয়ে দেখি মোহর আর রুমাল নেই। ছেলেরা ছুটল আমাদের উপরের তলার স্টোররুমে খুঁজতে। ততক্ষন আমরা লাইট নিভিয়ে দাঁড়িয়ে। মিউজিসিয়ানকে বললাম তুই বাজিয়ে যা ওরা ফিরে এসে বলল, পেলাম না। এদিকে হাকিম চেয়ারে বসে পড়েছে, নড়ে না। বলে, 'একজন ইজ্জতদার হাকিম, মাটিতে বসব!' তাকে বসিয়ে সিন চালু হল। দেখি, মীরমুন্সী ডায়লগ বলছে, "আইয়ে বাবুসাব, কি বেমারি বোলেন, চটাস্। মানে চড় নন্দের গালে না, নিজের গালে, বোঁ করে ঘুরে গিয়ে। গালের দাড়ি চেপে ধরতে, দর্শকের আড়ালে। একটু পরেই শুনি, বলবর

ফিসফিসিয়ে বলছে, "আরে খুল রাহা হ্যায়। সেকি কান্ড ব্যাটার কি লুঙ্গি খোলে নাকি? না তো, বসে আছে; কি করে হবে? তখন দেখি, হাকিমের দাড়ি প্রায় এক ইঞ্চি নেমে গেছে। হাকিম উসখুস করছে আর অল্প অল্প নাচছে। তারপর এক সাইড ঝপাস, খুলে বুকের উপর। এবার পাবলিকের কি হাস্যরোল। একবার করে চেপে লাগায় আর আবার খুলে পড়ে। এর মধ্যে রেগেমেগে সে ওদের বানানো জালি ডায়লগেই ফিরে গেছে নন্দ সামনে আসতেই এক হাতে দাড়ি চেপে অন্য হাত তুলে খামোশ বলে চেঁচিয়ে উঠেছে। অবশ্য তা খেয়াল করার মত অবস্থা দর্শকদের ছিল না। ষোলকলা পুর্ন হল যখন সে ধুত্তোর বলে রংবেরঙের দাড়ি টান মেরে ফেলে নগ্নগন্ডে রোল করতে লাগল। লাইট নিভে গেলেও হাসি আর থামেনা। হাকিম বার বার বলছিল, আমার এই কটা মাত্র ডায়ালগ, তাও হাসির না, এতে লোক হাসাব কি করে। সে দুঃখ ঘুচে গেল।

১০

এর পর আমাদের সবার মরাল খুব দমে গেলেও ঠিক করলাম, বাকিটা অন্তত ঠিক করে নামিয়ে মুখরক্ষা করতে হবে। কিন্তু তাতেও যে ভগবান (কোন দিন বিশ্বাস করি না বলেই বোধহয়) এমন ব্যাগড়া দেবেন কি করে জানব। পরের সিনে পিসিমা দিব্যি কান্নার ভাব করে যাচ্ছিল, যে এবার আমি কাশী চলে যাই, হটাৎ নন্দ দুহাত বাড়িয়ে বলে পিসিমা, তোমায় ছাড়া আমি বাঁচব না। খাইসে! এ কেমন প্রেমপুর্ন আকুতি! Gerontophilia নাকি? আবার অডিয়েন্স হেসে লুটোচ্ছে।

লোকজন উৎসাহ দিতে লাগল, প্রেমের দৃশ্যটাই তো আসল ক্লাইম্যাক্স, ঠিক করে নামা, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিকও হচ্ছিল। আগেই বলেছি, বিরহ-মিলনের গান আর সানাই জুড়ে এই সিনের মিউজিক ট্র্যাক, আর তার সাথে সময় মিলিয়ে করে প্র্যাকটিস করানো হয়েছিল। নন্দ প্রথম বার উঠতেই ল্যাপু অপারেটরকে বললাম, নে চালা। কিন্তু সে যে আগের সিনে মিউজিক ফেড আউট দিয়েছিল, ভলিউম সেই শূন্যই রয়ে গেছে। আওয়াজ আর হয় না। অ্যাক্টররা কোনো সূত্র না পেয়ে টেবিল থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এমন সময় অপারেটরের হুঁশ হল, ভলিউম ফুল করতেই জোরে সানাই। অ্যাক্টররা লাফ দিয়ে চেয়ারে বসে হাত ধরে ফেলেছে দুজনের। দর্শকরা হিন্টটা বুঝেছে, মোটামুটি হাসছে। আমরা বলছি, ওরকমই বসে থাক, লাইট নিভিয়ে একেবারে পরের সিন চালু করে দেব। তখন ল্যাপু অপারেটর, নিজের ভুল বুঝতে পেরে, প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে কেঁচেগন্ডুষ। আবার বিরহের গান থেকে চালিয়ে দিল। আমাদের মাথায় বাড়ি, দর্শকদের পেটে খিল।

১১

লাস্ট সিন আর পরিচয়পর্ব কোনরকমে হল, বিশদে জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না। এরপর পাগলা রাজা নিজেও প্রজাদের হাত থেকে মুক্তি পেলেন, আর প্রজারাও তাঁর স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি পেল।"*(২) অর্থাৎ আমি ঠিক করলাম, আর এদের সঙ্গে কাজ নয়; আর এরাও বলল, আর জগু ডাইরেক্টরের সঙ্গে সম্পর্ক নয়। শিক্ষা পেলাম, পরিচালনা করার ইচ্ছা থাকলে গোচালনাও শিখতে হয়!

*১- কমলাকান্তের পত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

*২ মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু সম্বন্ধে বদাউনীর উক্তি

সচল নামঃ কৌস্তভ
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/kaustubh

সোলস্-এর একটা গান আছে, "কেউ নেই করিডোরে, ক্লাস রুম গুলো ফাঁকা। চেনা সেই মুখখানি, মোনালিসার ছবি আঁকা"। স্মৃতির বইয়ের বিস্মৃতির নানা পাতায় বিচরণের পর যখন নিজের কলেজের শান্ত প্রাঙ্গণে ঢুকি, তখন সেখানে মোনালিসা মুখের কেউ না থাকলেও ক্লাস রুম গুলো ফাঁকাই থাকে। দরজাগুলো হাট করে খোলা। ভেতরে পাখা ঘুরছে। ফাঁকা বারান্দা ধরে এগিয়ে, খোলা দরজার সামনে দাঁড়ালে পাখার সেই বাতাস মেঝে গড়িয়ে পায়ে এসে মায়াভরা স্পর্শ দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "এতোদিন কোথায় ছিলে..."!

সেদিন প্রধান ফটকের পুরো দরজাটাই খোলা ছিলো। আব্দুল জলিল মাতবর, যিনি ফটকে দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখে নিতেন স্বেচ্ছায় কুরবানী হতে আসা নতুন মুরগীর আগমন। হয়তো মনে মনে বলতেন, "ওয়েলকাম টু দ্য হেল মামুর বিটা"। তাঁকে পাশ কাটিয়ে ছায়াঘেরা স্বল্প পথটুকু পেরিয়ে যখন মূল ভবনের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখি, তখনই বুঝতে পারি "এই দিন দিন না, আরও দিন আছে"।

দোতলায় রসায়ন ল্যাবের তিঁতকুটে গন্ধ পেরিয়ে যেই না ২০১ নম্বর রুমের দরোজার সামনে পা রেখেছি, অমনি ভেতর থেকে শুনতে পেলাম "রোল নাম্বার ফোর এইট ফোর থ্রিইইই..."। অন্তরাত্মা গেলো শুকিয়ে, ভর্তি হওয়ার আগেই 'লেইট'। কপালে খারাবিই আছে আমার। দরোজা থেকেই 'ইয়েএএএস' বলে চিৎকার করতে করতে ডায়াসের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বুকে তখন টিপু সুলতানের আমলের যুদ্ধের দামামা। মনে মনে দোয়া পড়ি, "এ যাত্রা ক্ষমা দান করো প্রভু!"

চিবিয়ে চিবিয়ে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "কতো তম"?

"জ্বী স্যার!"

"আরে মিয়া, বাংলা বুঝো না?"

"জ্বী, বুঝি স্যার..."

বাঁচালেন পাশের জন। "আরে কীসের কতোতম। মার্কস দেখেন না!"

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। পাশাপাশি নিজের কৃতকর্মের জন্য এই প্রথমবারের মতো অনুশোচনা হয়। কী হতো আর কয়টা নাম্বারের জন্য মন লাগিয়ে আরেকটু পড়লে! কী হতো পরীক্ষার মাসে পাটক্ষেতের আলে আড্ডা না মেরে পড়ার টেবিলে বই নিয়ে বসে থাকলে! কী হতো পরীক্ষার মাঝে বাথরুমের নাম করে উঠে গিয়ে আরেক রুমে পরীক্ষায় মগ্ন পোলাপানের জানালার সামনে নানা অঙ্গভঙ্গী না করলে! কী হতো, কী হতো...! ভাবনায় ছেদ পড়ে প্রথম জনের হুঙ্কারে।

"এই ধরো মিয়া। যাও, ঐখানে গিয়া বসো"। কী একটা কাগজ হাতে ধরিয়ে দেয়া হলো আমার, তাতে দেখলাম পেন্সিলে লেখা "এস-ফাইভ ওয়ান ফোর।" মুখ পাংশু করে এসে বসি অন্যদের সাথে। ডানে বামে তাকাই, "এরা সবাই অতোতম, শতোতম নাকি?" ভয়ে কথা বলি না। আমি নাইতম, এই অতোতমদের সাথে কী বলতে কী বলে ফেলি আবার! চুপচাপ বসে থাকি। সবার মাঝে মিল একটাই। এখানে সবাই জবাই হতেই এসেছে, স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়। মনে একরকম পাশবিক আনন্দ হয়, "ঠেলা আমি একাই বুঝবো না তাইলে!"

ওখান থেকে বেরিয়েই বারান্দায় আব্বাকে দেখতে পাই। তাঁর হাতে কাগজ-কুগজ ধরিয়ে দিয়েই বললাম, "চললাম!"

আমাদের স্কুল সেদিনই আমাদের ব্যাচের জন্য সম্বর্ধনার আয়োজন করেছে। আমাদের মধ্যে যে ব্যাটা 'অতোতম' হয়েছে, তাকে সহ আমরা যারা কোনো মতে 'টিটিএমপি' করেছি, তাদেরকে নিয়েও কী কী নাকি করা হবে! সবাই স্কুলে হাজির হবে, খুব সম্ভবত এই শেষবারের মতো একসাথে! আর হয়তো একসাথে এতোগুলো মুখ দেখা হবে না কখনোই! সেই ভাবনা থেকেই সবাই, যে যেখানে ছিলো, সেখান থেকেই স্কুলের দিকে ছুটে গিয়েছে। আব্বার হাতে ভর্তির কাগজপাতি ধরিয়ে দিয়ে আমার গন্তব্যও সেদিকেই ছিলো। তবে কারণটা সামান্য ভিন্ন!

আমাদের সাথে যে সব গোলগাল হলদেটে মুখের বালিকারা ছিলো, রূপ নিয়ে তারা দূরে চলে যাবার আগেই তাদেরকে একনজর শেষ দেখা দেখে নেওয়ার এই সুযোগ। লাইফ লাইনের রেলগাড়িতে চড়ে আমিই বা কোথায় চলে যাই তার কোনো ঠিকানা আছে নাকি! সুতরাং, মন চলোরে রূপের নগরে...।

প্রথম যেদিন কলেজে বিদ্যার্জনের জন্য যাই, মনে আছে আমাদের সময়ের এসএসসি ব্যাচের ঐ দিনই সর্বপ্রথম কলেজ পর্যায়ের ক্লাস। এই কলেজের আগে

অন্য কোনো কলেজ ক্লাস শুরু করার জুররত করতে পারে নি। ক্লাস শুরু করবে কী করে, তাদের তো ভর্তি প্রক্রিয়াই সম্পন্ন হয় নি তখনো! সারা দেশের মানুষ ভর্তির জন্য ফরম কিনে, আর আমরা হাজার খানেক অভাগা, পোড়া কপাইল্যা সকাল আটটায় চোখ ডলতে ডলতে আব্দুল জলিল মাতবরকে পাশ কাটিয়ে লাইট পার্পল ভবনের দিকে হেলেদুলে এগিয়ে যাই।

নোটিসবোর্ডে এস-ফাইভ ওয়ান ফোর খুঁজে পাই। তিনতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠে বাম দিকের ক্লাশরুমে গিয়ে বসে পড়ি ভয়ে ভয়ে। কে প্রথম ক্লাস নিতে ঢুকেছিলেন, তা এক যুগেরও বেশি সময় পরে আজ মনে পড়ছে না। তবে মনে আছে জওহরলাল স্যার এসে ক্যানভাসার ভোকাল নিয়ে গণিত বিষয়ক জ্ঞানদান করছিলেন। উদাহরণ হিসেবে বললেন অনেক কিছুই। এই গণিতই রাস্তায় হাঁটতে শেখাবে, এই গণিতই নাকি কলেজের ছাদে ওঠার রাস্তা বের করে দিবে। এই শুনে আমি পারলে বেঞ্চের তলায় গিয়ে লুকাই। কারণ কলেজে যেদিন ভর্তির ফরম জমা দিতে এসেছিলাম, সেদিন কী মনে করে সাথের দুজনকে নিয়ে ছাদে ওঠার পথ খুঁজে বের করে ছাদে গিয়ে উঠেছিলাম। সেই প্রথম, সেই শেষ। আমার মনে হচ্ছিলো আমার সেই অভিযান কোনোভাবে হয়তো জওহরলাল স্যার দেখে ফেলেছিলেন!

টেরেন্স স্যার ঢুকে তাঁর শিক্ষা জীবনের কথা বললেন। আমরা জানলাম, সারা এশিয়া থেকে একবার কী একটা বৃত্তি দেয়া হয়েছিলো, আর সেটা পেয়েছিলেন আমাদের টেরেন্স স্যার। আমরা আরও জানতে পারলাম, ছাত্রদের প্রতি তাঁর 'ভালোবাসার প্রকাশ' পায় 'কিল, ঘুষি, থাপ্পর আর কখনো পাছায় লাথি'র মাধ্যমে। এই শুনে আমি যখন অবচেতনে নিজের পশ্চাৎদেশে হাত বুলাচ্ছি, তখনই তিনি জানালেন, 'আজকেই শেষ'। এরপর থেকে তাঁর মুখ থেকে, তাঁর ক্লাসে কখনো কেউ আর বাংলা শুনতে পাবে না। বলতেও পারবে না। ভুল হোক, শুদ্ধ হোক, ইংরেজিই বলতে হবে। আর কিছু না হোক, অন্তত টেরেন্স স্যারের সেই ক্লাসের কথা আমি আজও ভুলি নি। ভুলবোও না কখনো! কারণ, শুধু ইংরেজি না, আজকে আমি সম্পূর্ণ বিদেশী একটা ভাষা যে বলতে পারছি, নিদেনপক্ষে কাজ চালানোর মতো, এর পিছনে টেরেন্স স্যারের সেদিনের ক্লাসের সেই কথাগুলোই মূল ভুমিকা পালন করেছে। এটা আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

অমর চাঁদ দাস তালুকদার (এসি দাস) স্যার এসে মনে পড়ে সেন্ট যোজেফ'স খোঁজ করছিলেন। ধরে ধরে সবাইকে দাঁড় করাচ্ছিলেন আর ঢাকার পরিচিত স্কুল না হলে, 'অতোতম' না হলে 'দুটা' কথা বলে বসতে বলছিলেন। আমি নেহায়েত কোনো এক গ্রামের স্কুলের গ্রাম্য ক্ষেত। অতোতম দূরের কথা কোনোমতে টিটিএমপি। আমি মনেপ্রাণে ঈশ্বরের নাম জপি আর বেঞ্চের তলায় সেঁধে যাই। খানিক সংকোচে, খানিক লজ্জায়। তারপর কী যেনো হলো। আমার তিন চার বেঞ্চ আগে এসে কোনো এক ছেলের প্রতি তীব্র অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বকাঝকা করতে গিয়ে এসি দাস স্যার সেই অনুষ্ঠানের সেখানেই সমাপ্তি টেনে দিলে আমি মুক্তি পাই। ঘাড় সোজা করে আবার বেঞ্চে সুস্থির হয়ে বসি। ঠিক তখন থেকেই শুরু হয় আমার কলেজকে নিজের বলে মনে করা। শুরু হয় আমার কলেজের দিনগুলি।

বেশ লম্বা একটা ছুটির পর আমাদের ক্লাস শুরু হয় আবার। এবার অন্য কক্ষে। পুরো কলেজ জীবনের জন্য স্থায়ী একটা কক্ষ। নিন্দুকেরা যেটাকে 'গ্রুপ সিক্স' বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। একে একে বন্ধু তৈরী হতে থাকে। যোজেফাইটদের সাথে বিরূপ সম্পর্কও। গ্রুপ সিক্স অনেক কিছুর সাক্ষী হয়ে রয়ে যায় নিশ্চুপ। একে একে মানিক স্যারের 'চাপা' শুনি। ভুঁইয়া স্যারের 'হাগু সংক্রান্ত' বাক্য গঠনে পারদর্শিতায় মুগ্ধ হই। কখনো ঠা ঠা করে হাসি, কখনো মুখ পাংশু করে গালাগাল শুনি। কখনো লেজ বের করে সেটা দিয়ে নিজের কান চুলকাই, অপরকে চুলকে দিই। কখনো সেই লেজ লুকিয়ে ভদ্রটি সেজে যাই। কখনো দুষ্টু ছবি দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে পেছনের সবার সাথে সারা ক্লাস কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, কখনো জালানা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শরতের নীল আকাশ দেখি। এভাবেই পাশের নতুন ভবন তৈরীর ধুপুর ধাপুর শব্দে কেটে যেতে থাকে ৩১৬ নাম্বার কক্ষের গ্রুপ সিক্সের কলেজের দিনগুলি মোর।

আমাদের যেদিন প্রথম ক্যুইজ হয়, সেদিন ছিলো পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ। ফিজিক্স ল্যাব থেকে ক্যুইজ শেষ করে বেরিয়ে দেখতে পাই ফাদার পিশোতো জানালার খুলে নেয়া একটা কাচে বুনসেন বার্নারের শিখা থেকে কালি মাখিয়ে সেটা দিয়ে সবাইকে সূর্যগ্রহণ দেখাচ্ছেন। সবাই লাইন ধরে ধরে এগুচ্ছে। আমি ধুম করে লাইন ভেঙে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যে দেখছিলো তার হাত থেকে কাচটা নিয়ে চোখের সামনে ধরার আগেই ফাদার পিশোতো আটকালেন আমাকে। হাত থেকে কাচটা কেড়ে নিয়ে পুরো বাংলায় বললেন, "সব্বার পিচ্ছনে যাবে, টাপ্পর আসবে। লাইন ঢরে।"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে সবার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং লাইন মেনে রেখেই জীবনের প্রথম সূর্যগ্রহণ দেখেছিলাম। সেদিনের সেই ঘটনা আমাকে বেশ বড় একটা জিনিস শিখিয়েছিলো 'শৃঙ্খলা'। সেদিন থেকে আজ, আপাত এই লম্বা সময় পরেও এখন পর্যন্ত শিক্ষাটা আমার সঙ্গে রয়ে গেছে। সাথে রয়ে গেছেন ফাদার পিশোতো। দেশের বাইরে এসে সেই শিক্ষাটা আমাকে অনেক বিব্রতকর অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছে। কারণ সেদিনের পর থেকে আমি আর লাইন ভেঙে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি নি। ফাদার পিশোতো আমাকে দাঁড়াতে দেন নি।

ফিজিক্স ল্যাবের দিনটা আমার কাছে এক ভয়ানক দিন মনে হতো। প্রথম দিনের মিটার স্কেলের ব্যবহার আমি শেষদিন পর্যন্ত মেলাতে পারি নি। মেকাপ খেতে খেতে স্বপ্নেও মেকাপ খাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো আমার। আসলে মেকাপ খেতে কষ্ট হতো না যদি নতুন করে প্র্যাক্টিক্যাল শিট লিখতে না হতো! যে পরিমান সময় আমি ফিজিক্সের প্র্যাক্টিক্যাল শিটের পিছনে ব্যয় করেছি সে পরিমান সময় পদার্থবিদ্যার পিছনে ব্যয় করলে আমার মতো অপদার্থও একজন নামী পদার্থবিদ হয়ে যেতে পারতো।

কেমেস্ট্রি ল্যাবে ব্রাদারদের ঝাড়ি খেতে খেতে জান খান্দান হয়ে যাবার যোগাড় হতো প্রায়ই। কোনো এক বিচিত্র কারণে কেমেস্ট্রির ব্রাদাররা আমাকে একেবারেই ভালো পেতেন না। কিছু জিজ্ঞেস করলেই এমনভাবে ঝাড়ি মারতেন যেনো আমি তাদের সদ্য পরিচিত মেয়ে বন্ধু'র বাসার ফোন নাম্বার চেয়ে বসেছি! একবার এক বন্ধু কী একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে বললো এক ব্রাদারকে গিয়ে। আমি উক্ত ব্রাদারের উদ্দেশে মুখ খারাপ করে (লেভেল টু) অপারগতা প্রকাশ করলাম। তার খানিক পরেই আরেক ব্রাদার এসে বলা নেই কওয়া নেই, আমাকে বললেন কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে।

"ভাইয়া, ল্যাব করি তো!"

"তোমার ল্যাব করতে হবে না। বন্ধুরা করে তোমার শিট ফিলাপ করে দিবে।"

"কিন্তু ভাইয়া..."

"আর একটা কথা বললে আমি এসি দাস স্যারের কাছে তোমার নামে রিপোর্ট করবো!"

এসি দাস স্যারের কথা শুনে আমি দমে যাই। স্যারের কাছে একদিন ল্যাবে দৌড়ানি খেয়েছিলাম আক্ষরিক ভাবেই। আমি আগে আগে স্যার আমার পিছন পিছন। সেই ঘটনার পর থেকে আমি এসি দাস স্যারের সামনে মিচা বিড়ালের মতো চুপ করে থাকি। স্যারের কাছে রিপোর্টের কথা শুনে ব্রাদারের কথায় ল্যাবের কোণে গিয়ে কান ধরে দাঁড়িয়ে পড়ি চুপচাপ! হাজার হোক, দোষ তো আমারই!

অপেক্ষাকৃত লম্বা স্কুল জীবনের চেয়ে গোটা কলেজ জীবনে কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতার পাল্লা আমার বেজার ভারী। ক্লাসরুম তো বটেই, টেরেন্স স্যারের রুমের সামনের বারান্দাও আমার কানে ধরে দাঁড়িয়ে থাকার মহান অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিবে।

তবে সবচেয়ে মজা হতো বায়োলজি ল্যাবে। যেদিন বায়োলজি ল্যাব থাকতো, সেদিন সকাল থেকেই সবকিছু বেশ ফুরফুরে লাগতে শুরু করতো। মিজান স্যার লম্বা লেকচার দিয়ে চলে যেতেন। অমল স্যার দিতেন পেছনে গিয়ে তার আরামকেদারায় শুয়ে ঘুম! তারপর আমরা আমরাই। ল্যাবের এমাথা ওমাথা করে এর মাথায় চাটি, ওর ঘাড়ে গুঁতা, পটাশ করে পিঠে থাবড়া, এগুলো চলতো বেশ ঘটা করে। মাইক্রোস্কোপ ব্যবহারের সময় কোনো গ্রুপে কেউ একজন হয়তো প্রবল মনোযোগে কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করছে, অন্যগ্রুপ থেকে এসে তার পশ্চাৎদেশে হয়তো দিয়ে বসলো কেউ তীব্র চিমটি! একহাতে পশ্চাৎদেশ ডলতে ডলতে মুখ তুলে যেই না মুখ খারাপ (লেভেল ফাইভ, হাইয়েস্ট) করতে যাবে, অমনি বাকিরা মুখে আঙুল তুলে 'হুঁশশশ' করে ইশারায় ল্যাবের পিছনে নির্দেশ করতো, "অমল স্যার কিন্তু এখনও ঘুমায় নাই..."! পরে আমাদের পুরো গ্রুপে অবস্থা এমন হয়েছে যে, মাইক্রোস্কোপে কেউ চোখ রাখতে গেলে একহাতে পেছন দিক চেক দিয়ে রাখতো!

একদিন আজমল স্যার কী নিয়ে যেনো আলাপ করছিলেন ক্লাসে। তো কথায় কথায় বললেন, "এই যে রাজ্জাক, খাড়াও!" তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে, সামান্য ডানে ঝুঁকে গিয়ে, মোচড়া দিয়ে বাঁ দিক দিয়ে পিছনে তাকাতেই আবার শুনি, "পিছনে কী দেখো মিয়া। তোমারেই বলি। খাড়াও।" [ক্লাসের বাকি সবার দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ। থেকে থেকে সবাই ট্রেডমার্ক হো হো হাসি দিয়ে যাচ্ছে গোটা সময় জুড়েই]

"আমি স্যার?"

"তো আবার কে!"

"জ্বী স্যার!"

"রাজ্জাকরে চিনো?"

"কোন রাজ্জাক স্যার!"

"নায়ক রাজ রাজ্জাক। চিনো?"

"চিনি স্যার। নায়অঅক রাআআজ রাজ্জাক..." [সবার দম ফাটানো হাসি]

"অর চুলগুলা তোমার মতোই ঢেউ খেলানো।"

"জ্বী স্যার।" [চুলে হাত বুলিয়ে]

"প্রেম করো?" [এবার আর হাসির শব্দ বাঁধ মানে না]

এর মধ্যে একজন বলে ওঠে, "স্যার করে মনে হয়। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে!"

"না স্যার, এখনো সেই দুর্ভাগ্য হয় নি!"

"কও কী! বুড়া হইয়া প্রেম করবা নাকি মিয়া!"

"হে হে হে"

"আচ্ছা, ধরো ডিএমসিতে তুমি ফোর্থ ইয়ারে পড়ো। সেকেন্ড ইয়ারের কোনো এক ভিকি [এটা বাকিদের অনুরোধে], যে কি না আবার ভয়ানক সুন্দরী, তোমারে ভাইয়া ভাইয়া বলতে অজ্ঞান। তুমিও তার প্রতি খানিকটা দুর্বল। নিজের নোট টোট দাও তারে পড়তে।"

"জ্বী স্যার। ভাবতে ভালোই লাগছে।"

"তোমার ছোট ভাই আছে?"

"আছে স্যার।"

"তোমার ছোট ভাই একটা আপেলের অর্ধেক খেয়ে তোমারে দিলে কী করো, খাও নাকি রেখে দাও বা ফেলে দাও!"

"খাই না স্যার।"

"গুড। আচ্ছা, এইবার মনে করো তোমারে ভাইয়া ভাইয়া করা সেই সুন্দরী একটা আপেল অর্ধেক খেয়ে তোমার হাতে দিলো, তুমি কি করবা? খাবা নাকি ফেলে দিবা?"

[গোটা ক্লাসের পোলাপান বেঞ্চ মেঝেতে মেরে হাসির তোড় প্রকাশ করতে থাকে। আমি খানিক ইতস্তত করতে থাকি, কী বলবো এই ভেবে]

"খাইয়া ফালামু স্যার"

"হে হে হে। চিন্তা করছো! নিজের ভাইয়ের আধাখাওয়া আপেল সে খাবে না। অথচ অচেনা এক সুন্দরীর আধাখাওয়া আপেল ঠিকই খাবে সে!"

আমিও বোকার মতো খিলখিল করে হাসতে থাকি বাকিদের সাথে তাল মিলিয়ে। হাসি থামলে আমাকে বসতে বলে স্যার এবার নানা ধরণের সংক্রামিত রোগ নিয়ে বলতে শুরু করেন। লালা'র মাধ্যমেও কিছু রোগ ছড়াতে পারে। সুতরাং কোনো সুন্দরী আধা খাওয়া আপেল সাধলেই টুক করে খেয়ে ফেলা ঠিক হবে না। আগে সুন্দরী সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। শুনে আমরা নড়ে চড়ে বসি।

বিয়ে করার সময় পাত্রীকে কী কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া যেতে পারে পরবর্তী জেনারেশন সুস্থ হবে নাকি নানা বংশগত রোগে ভুগবে, এ ব্যাপারেও আমরা জ্ঞানপ্রাপ্ত হই। ক্লাস শেষ করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আজমল স্যার বলেন, "যদি দেখো, এই প্রশ্নগুলো কোনো মেয়ে উলটা তোমারে করতেছে, তাইলে বুঝবা সে ভিকারুন্নেসার আর সে আমার ক্লাস করছে...!"

একবার এক দুপুরে আকাশ ব্যাপক অন্ধকার করে ফেললো। আমরা দুই বন্ধু (ত্রিরত্নের দুজন) ঠিক করলাম এমন একটা দুপুরে ক্লাসে বসে থাকার মানে হয় না। ক্লাসে বাং মারবো, এবং সেটা সেলিব্রেট করতে মধুমিতায় সিনেমা দেখতে যাবো। তৃতীয়জনকে জানাতেই সে বিগড়ে গেলো। সে কিছুতেই বাং মারবে না উপরন্তু ক্লাস বাং মারার নানা কুফল আমাদেরকে বয়ান করা শুরু করলো সে। কিন্তু আমরা দুজন অনড়। আজকে যখন একবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ক্লাস আজকে করবোই না। শেষ পর্যন্ত আমাদের জয় হয়। ক্লাস শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে আমরা তিনজন নেমে আসি খালি সিঁড়ি ভেঙে। মূল ভবনের বারান্দা ছেড়ে রাস্তায় নামতেই শুরু

হলো তুমুল বৃষ্টি। আমরা পিছনে ফিরে না গিয়ে দৌড়ে ঢুকে যাই সাইকেল গ্যারেজে। সেখানে তিনজনে তিনটা ইটের উপর বসে স্মৃতিকাতর হই। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি। হাসি, মন খারাপ করি। তিনজনে সবসময় একই সঙ্গে থাকার প্রতিজ্ঞা করি। একসময় গ্যারেজে বৃষ্টির পানি ঢুকে পড়ে। আমরা ইট সরিয়ে আরেকটু নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই। গায়ে যেনো গ্যারেজের মেঝে ধোয়া বৃষ্টির নোংরা পানি না লাগে! আমাদের ত্রিরত্নের আড্ডাবাজী চলতে থাকে বাইরের বৃষ্টির সাথে পাল্লা দিয়ে। ক্লাস শেষ হয় একসময়, সবাই একে একে বাড়ি যায়, আমরা তখনও বসে থাকি সেখানে। সন্ধ্যার আলো জ্বলে মতিঝিলের রাস্তায়। উঁচু দালানগুলোতেও। ক্যাম্পাসেও ভুতুরে আলো জ্বালানো হয়। কেবল সাইকেল গ্যারেজে কোনো আলো জ্বলে না। আমরা তিনজন কারো মুখ দেখতে পাই না। কিন্তু একেকজনের অস্তিত্ব অনুভুব করতে পারি। অস্তিত্বের অনুভবে আমাদের অতীত-ভবিষ্যতের গল্প এগিয়ে যায়। আমরা তিনজন সওয়ার হই টাইম মেশিনে।

ক্যাম্পাস থেকে সর্বশেষ মানুষটিও বেরিয়ে গেলে দারোয়ান মামা এসে পেছন থেকে জিজ্ঞেস করেন, "মামা, বাড়ি যাবেন না!" আচমকা টাইম মেশিনের গতি থেমে যায়। আমি পেছন ফিরি। সময়ের উপত্যকায় হারিয়ে যায় বাকি দু'জন।

সামনে এসে দাঁড়ান আব্দুল জলিল মাতবর। বয়সের ছাপ পড়েছে তাঁর মুখে। আমার মুখেও বোধকরি। কলেজ ছেড়ে গেছি, নেহায়েৎ কম সময় হয় নি তো! এর মধ্যে আমরা ত্রিরত্ন তিনদিকে চলে গিয়েছি। একসঙ্গে থাকা হয় নি আমাদের। কোনোভাবে-ই হয়ে ওঠেনি, জোর করেও না। সময়ের কারণে সেই বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যার সাইকেল গ্যারেজের স্বপ্ন বুননের ছোট্ট অধ্যায়টুকু আমাদের অবচেতন মনে ঠাঁই নিয়েছে স্মৃতি হয়ে। সময়ের কাছে আমরা ত্রিরত্ন হয়েছি পরাজিত!

"যাবো মামা।" বলে উঠে যাই। এগিয়ে যাই রাস্তাটা ধরে। ডানদিকে মার্টিন হল, ক্যান্টিন। সেদিকে যাই না। নতুন ভবন লাগোয়া মূল ভবনের দিকে আমি হাঁটি। ফাঁকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। বিদায় নেই নিজের স্বপ্নচারণভূমি থেকে। সাড়ে পাঁচ বছর আগের সেই সন্ধ্যাটির পরের সকালেই ছিলো আমার ফ্লাইট!

সচল নামঃ ধুসর গোধূলি
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/dhushor

ঢাকা কলেজের ঢাকনাহীন বয়ান

...নজরুল ইসলাম

০১

কিশোরবেলা থেকেই আমি জানি যে আমি কোনোমতে এসএসসিটা পাশ করে ভর্তি হবো মিরপুর সরকারী বাঙলা কলেজে। তারপর রাজনীতি করবো। এইম ইন লাইফ।

এসএসসি পাশ হলো। সবাই কলেজের ফর্ম তুলছে। অনেক অনেক কলেজ থেকে। আমার অতো ভাবনা নাই। কারণ বাঙলা কলেজে শুধু ফর্ম জমা দিয়ে পরীক্ষায় এটেন্ড করলেই আমার ভর্তি নিশ্চিত। তো আর কলেজ থেকে ফর্ম এনে লাভ কী?

তবু ঢাকা কলেজের তখন ভীষণ ক্রেজ। আমিও একটা ফর্ম কিনে এনে ফিলাপ করে জমা দিয়ে দিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। ফর্মের দাম বোধহয় তখন মাত্র দশ টাকা ছিলো। পরীক্ষাও দিলাম।

আমি জীবনে কখনোই লেখাপড়ার ব্যাপারে সিরিয়াস ছিলাম না, ছাত্র ছিলাম ততোধিক পরিমাণ খারাপ। ঢাকা কলেজে চান্স পায় দেশের সেরা ছাত্ররা। আর আমি অবাক হয়ে দেখলাম আমার স্কুলের বাঘা বাঘা ছাত্রদের বাদ দিয়ে আমি কীভাবে যেন চান্স পেয়ে গেছি! আমার পুরা মহল্লায় আমিই একমাত্র!

ব্যাস আমার জীবনটা গেলো পাল্টে। আমার যদিও ইচ্ছা ছিলো না, কিন্তু সবাই চাপ দিতে লাগলো, ঢাকা কলেজে চান্স পেয়েও ভর্তি না হওয়াটা নাকি ক্রাইমের সমতুল্য। আমাকে ভর্তি হতে হলো।

০২

বন্ধুরা সবাই মিলে তিনদিনের জন্য তাবলীগ করতে গেলাম। এটাও ফান করতেই যাওয়া, সেই গল্প আপাতত থাক। তাবলীগ থেকে বাড়ি না ফিরে সোজা চলে গেলাম ঢাকা কলেজে। সেদিনই ছিলো আমার প্রথম ক্লাস। তাবলীগের বোচকা বুচকী বন্ধুদের হাতে পাঠিয়ে দিলাম বাড়ি।

কলেজে গিয়ে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া! কক্ষী মমিন টাইপ অবস্থা। কাউরে চিনি না। শত শত ছাত্র একটা গ্যালারিতে বসা। আমি ভয়ে ভয়ে পিছনের দিকের একটা বেঞ্চিতে বসলাম। ক্লাস শুরু হলো। কিন্তু মন বসলো না। কী করি?

ঢাকা কলেজের গ্যালারিগুলো থেকে ক্লাস ফাঁকী দেওয়ার পদ্ধতি কর্তৃপক্ষই করে রেখেছেন। পেছন দিকে আছে দুটো দরজা। আমি দেখলাম দুয়েকজন চামে সেদিক দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। আমিও বের হয়ে গেলাম। কিন্তু এখন কী করবো? কাউরেই চিনি না। গেলাম ক্যান্টিনে। সেখানে গিয়ে পরিচয় হয়ে গেলো আমাদের ব্যাচের কিছু ছাত্রর সঙ্গে। নিজেরাই ধরে নিলাম প্রথম দিনের প্রথম ক্লাস যারা পালাতে পেরেছে, তারা লাইনের লোক, এক মানসিকতার। সো বন্ধুত্ব হতে পারে। হয়েও গেলো সেদিনই সিদ্ধান্ত হলো আমরা রাজনৈতিকভাবে যে যা খুশি করি, কিন্তু আমাদের এই গ্রুপ আমরা কখনো আলাদা হবো না। কোনো পার্টিগত দ্বন্দ্ব এই গ্রুপে খাটবে না।

০৩

তারপর থেকে প্রতিদিনই কলেজে যাই। ক্লাসের ধারে কাছেও যাই না। ক্যান্টিন, আড্ডা, মিছিল, নিউমার্কেট। এই হলো আমার কলেজের গণ্ডী।

ততদিনে রাজনৈতিক শিবিরের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। আমাদের কলেজের ভিপি তখন তুলা ভাই [পরে এমপি হইছিলো।], তবে সবচেয়ে পাওয়ারফুল ছিলো ছাত্রদলের সভাপতি আউয়াল ভাই। কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতির নামটা মনে করতে পারছি না এখন। ভুলে গেছি।

আমাদের গ্রুপটারে দল, লীগ সবাই আলাদা চোখে দেখতো। চা সিগারেট দুই পার্টি থেকেই আমাদের আড্ডায় পাঠানো হতো ফ্রি। এর জন্যে মিছিল করতে হতো না। তবু মাঝে মধ্যে মিছিল করতাম। ছাত্রলীগের। তখন ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলো মাজহারুল আনাম ভাই। উনি আমার এলাকার মানুষ, আর আমার সবচেয়ে কাছের বাল্যবন্ধুর আপন বড় ভাই। সেই সুবাদে ঢাকার প্রায় সব কলেজেরই ছাত্রলীগের নেতৃত্বের সঙ্গে আমার তখন ব্যাপক খাতির। সব

কলেজেই যাই।

পরবর্তীতে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি হইছিলো পলাশ। সেও আবার আমার পাশের এলাকার বন্ধু। তার অনুরোধেও মিছিলে যেতে হইতো মাঝে মধ্যে। [এর বহুবছর পর পলাশ কল্যানপুরে গুলি খেয়ে মারা গেছিলো]। আর ছিলো সুজন। আব্দুল কুদ্দুস মাখনের ভাতিজা। তারে ডাকতাম ঘি বলে। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে। একটা হলুদ এক্সএল বাইক নিয়ে ঘোড়ার মতো ছুটতো চিকনা ফর্সা ছেলেটা। ফার্স্ট ইয়ারে থাকতেই ধরা পড়লো রাইফেলসহ। বাংলাদেশের শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় তিন নম্বরে নাম উঠছিলো সুজনের। সেই অবস্থাতেই প্রতিপক্ষের গুলি খেয়ে মারা গেলো সুজন।

তবে আমার ভালো লাগতো তরুণকে। জানি না তরুণ এখন কোথায়, কেমন আছে। কলেজ লাইফের কোনো বন্ধুর সঙ্গেই আমার এখন যোগাযোগ নাই। তরুণ, ড্যানিশ, ছোটন, শাওন, মনোয়ার... সবাই হারিয়ে গেলো। আমি একটা সময় জীবন থেকে রাজনীতির সম্পর্ক ফেলে দিলে, সবার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তবে এখনো মনে পড়ে এদের কথা। কাল্লু রুবেলের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মধ্যে। তার লগে অনেকের যোগাযোগ আছে। রুবেল বার বার বলে পুনর্মিলনীর কথা। এখন এই লেখা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, পুনর্মিলনীটা করতেই হবে।

০৪

আমাদের গ্রুপটার খুব মারামারির বাতিক ছিলো। প্রথম মাসেই আশেপাশের প্রায় সব কলেজে রেইড দেওয়া শেষ। শুধু খবর পাইলেই হইতো যে অমুক কলেজের কেউ ঢাকা কলেজের কাউরে কিছু কইছে। নগদে কলেজের সামনের টেম্পো স্ট্যান্ড থেকে টেম্পো দখল করে সেই কলেজে রওনা। কতক্ষণ হুদা ভাংচুর করে বীরদর্পে কলেজে ফেরা।

গণ্ডগোল এমনকী লাগাইলাম আমাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও। ছাত্রদল যেদিন আমাদের সংবর্ধনা দিলো, সেদিন সেকেন্ড ইয়ারের পোলাদের ধরে পিটানো হলো গজারীর ডাইল দিয়া। আর সেই অপরাধে ছাত্রদল কমিটি ধরে শাস্তি দিলো শুধু মনোয়াররে।

ফার্স্ট ইয়ারে থাকতেই পিটানো হইলো এমনকী ছাত্রলীগ সভাপতিরেও। এর পরদিন অবশ্য তার প্রতিশোধ হিসেবে একদল অচেনা বাইকারোহী এসে পিটিয়ে থুয়ে গেলো। মজার কথা হইলো এই দুইদিনের একদিনও আমি একটা ব্যক্তিগত কাজে কলেজে যাই নাই। তৃতীয় দিন গিয়া শুনলাম গঠনা।

এছাড়াও অনেক গ্যাঞ্জাম হাঙ্গামা আছে। থাক সেসব কথা।

০৫

আমার আরেক গ্রুপ বন্ধু ছিলো, যারা মূলত ঠিক এই গ্রুপের উল্টা। যারা দেশের সব সেরা ছাত্ররা। রফিকউল্লাহ সানা তার মধ্যে একজন। এসএসসিতে যার রেজাল্ট সর্বকালের সেরা। আরো ছিলো মিঠু, সিমু। সবাই বিভিন্ন বোর্ড থেকে মেধাতালিকায় ঠাঁই পাওয়া। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে এদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব খুব ছিলো। সানার সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে, তবে তেমন বেশি না। ফেসবুকে বন্ধু তালিকাতেই কেবল। আর কোনো প্রোগ্রাম ট্রোগ্রামে দেখা হলে হাই হ্যালো। আর সিমু সেই যে ব্যাঙ্গালোরে গেলো ইকোনোমিক্স নিয়া পড়তে আর যোগাযোগ হলো না। যোগাযোগ হলো না মিঠুর সঙ্গেও। অথচ এরা সহযোগিতা না করলে আমি স্রেফ মেট্রিক পাশ থেকে যেতাম আজীবন।

০৬

লেখা বড় হয়ে গেছে অনেক। এবার লাগাম টানি।

কলেজে ভর্তি হয়েই পাঙ্খা গজিয়েছিলো। নানারকম সংগঠন করা শুরু করলাম। সংগঠনের বাতিক আমার সবসময়ই ছিলো। স্কুলে থাকতেই তুমুল স্কাউট ছিলাম। প্রেসিডেন্ট এ্যাওয়ার্ডও পাইছিলাম। কিন্তু ঝগড়া বিবাদ করে রোভার স্কাউটিং করলাম না। তার বদলে অনেক সংগঠন শুরু করলাম। স্বাস্থ্যের দিক থেকে তালপাতার সেপাই ছিলাম, তাই শখ থাকা সত্ত্বেও বিএনসিসি'তে ভর্তি হতে পারি নাই। কিন্তু লিও ক্লাব, যুব রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থেকে শুরু করে টিএসসি

কেন্দ্রিক নানান সংগঠন। আবৃত্তি, বিতর্ক, চলচ্চিত্র সংসদ... কোনোটাই বাদ দিলাম না। আমি কিন্তু পারফর্মার না, সংগঠক। আবৃত্তি করি না, কিন্তু অনুষ্ঠান থাকলে মঞ্চসজ্জায় জোগালী খাটি... এই হইলাম আমি।

তবে কলেজ লাইফেই সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে গেলাম দুইটা সংগঠনের সাথে। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আর মঞ্চ নাটক। এই দুটোই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো বড় রকমের। এ দুটো নিয়ে বলতে গেলে এই ইবুকে আর কারো লেখা স্থান পাবে না। তাই অফ গেলাম।

আরো একটা আছে, সেটাও এই কলেজ লাইফ থেকেই শুরু। সাংবাদিকতা। পত্রিকায় প্রদায়ক হিসেবে শুরু। তারপর এটাই হয়ে যায় জীবিকা। মূলত কলেজের প্রথম বর্ষ থেকেই আমার জীবনের নতুন লক্ষ্য, নতুন সম্ভাবনা সব ঠিক করে ফেলেছিলাম। এখনো পর্যন্ত সেই পথেই আছি।

০৭

এবার শেষ করা দরকার। তবু বলে রাখি। কলেজ নিয়ে স্মৃতিচারণ করছি, কিন্তু কলেজে ক্লাস করেছি কয়টা তা আমি গুনে গুনে বলে দিতে পারবো।

প্রথম বর্ষের প্রথম ক্লাস করেছিলাম আধেকটা। এরপর আর একটাতেও আমার এটেনডেন্স ছিলো না। যদিও দুটো ক্লাসে হাজির ছিলাম, কিন্তু হাজিরা দেই নাই। সেই দুটো ক্লাসে হাজির হওয়ারও বিশেষ কারণ ছিলো- জানতে পারলাম মনোবিজ্ঞানের ক্লাস নেয় অতীব সুন্দরী এক টিচার। একবার দল বেঁধে তার ক্লাস করতে গেছিলাম। আরেকবার শুনলাম ইংরেজীতে এক টিচার নাকি আছে অদ্ভুত। যিনি ক্লাসে ঢোকেন, রোলকল করেন, পড়ানো শুরু করেন, ঠিক ক্লাস শেষের ঘন্টা বাজলে বের হয়ে যান। ছাত্রদের দিকে ফিরেও তাকান না। ডিস্টার্ব করলেও কিছু বলেন না।

তো আমরা দল বেঁধে একদিন গেলাম ডিস্টার্ব করতে। পুরো ৪৫ মিনিট যা খুশি তাই করলাম সবাই মিলে। কিন্তু স্যার আমাদের দিকে ফিরেও তাকাইলেন না!

একসময় থিয়েটার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম, কলেজেই গেলাম না বেশ অনেকদিন। তখন তো মোবাইল কালচার নাই, আমাদের বাড়িতে টিএন্ডটিও ছিলো না। আমি তাই জানিই নাই। এই অবসরে কলেজে প্রথম বর্ষ সমাপনী পরীক্ষা হয়ে গেছে। সেই খবর আমি পাইলাম যেদিন কলেজের প্রিন্সিপাল রেজিস্ট্রি করা চিঠি পাঠাইলো আমার বাপের নামে। সেখানে লেখা আমি প্রথম ক্লাসের পর থেকে একটাও ক্লাস করি নাই। কর্তৃপক্ষ বুঝতেই পারতেছে না আমি আদৌ এই কলেজে এখনো আছি কী নাই!

সেইটাও সামাল দিতে হইলো রাজনৈতিক প্রভাব খাটায়া। উঠলাম দ্বিতীয় বর্ষে। কিন্তু আর লিখতে পারুম না। দ্বিতীয় বর্ষের গল্প আরেকদিন।

আর পরীক্ষার গল্প বলার জন্য লাগবে তৃতীয় পর্ব! ছাত্র হিসেবে আমি আবার খুব বিশেষ কিছু ছিলাম কী না!

সচল নামঃ নজরুল ইসলাম
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/nazrul_islam

স্মৃতির বুদবুদগুলো

...প্রকৃতিপ্রেমিক

স্মৃতি হাতড়ানো যেন সমুদ্রের মাঝে হারানো মুক্তো খোঁজা। কতদিন কত বছর কত সময় কত মুহূর্ত- স্মৃতির পাতা ভরে আছে সেই সব দিনের কথা। চোখ বন্ধ করে আমি পড়ে যাই পাতার পর পাতা, ক্লান্তিহীন। চোখ খুললেই আবার হারিয়ে যায়, বাস্তবে ফিরে আসি, আবার চোখ বন্ধ করি, ফিরে যাই ১৮ বছর আগে। দেড় যুগ আগের কথা অথচ মনে হয় এই সেদিনের কথা। মতিঝিলের আরামবাগের কলেজটি আমার স্মৃতির মানসপটে ঠাঁই করে নিয়েছে আজীবনের জন্য। ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার দিন থেকে শেষ দিনটি অবধি হাজারো স্মৃতিতে ভরা আমার কলেজের দিনগুলো। সবকিছু তো আর পাতায় লেখা যায়না, শুধু বুদবুদের মত উল্লেখযোগ্য কিছু স্মৃতিই আজ শেয়ার করছি।

মাসুমের সাথে শুক্রাবাদ বাসস্ট্যান্ড থেকে যখন লোকাল বাসে উঠি তখনো জানতাম না কলেজের প্রথম দিনেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে এরকম অস্বস্তিকর একটা ঘটনা। তখন ২ কি আড়াই টাকা দিয়ে শুক্রাবাদ থেকে মতিঝিলে যাওয়া যেতো। নীলক্ষেতে এসেও আমরা কোন সীট পেলাম না। পাওয়ার কথাও নয়, কারণ অফিস আওয়ারে সবাই যাচ্ছে মতিঝিল। বাসের রড ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমি আর মাসুম। মাসুম আমার কলেজমেট। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট থেকে পাশ করে ঢাকায় এসেছে। স্মৃতি যদি খুব প্রতারণা না করে তাহলে মনে পড়ে হাত ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি ৮টার একটু কম বাজে। কলেজ সম্ভবত সাড়ে আটটা থেকে। দুজনের কেউই জানতাম না কারণ নটরডেমের ওরিয়েন্টেশনে আমরা কেউই যাই নি। সেদিন ঢাকা কলেজের ভর্তি পরীক্ষা ছিল। অনিচ্ছা সত্তেও যেতে হয়েছিল আব্বার অনুরোধ রক্ষা করতে। এর মধ্যে নটরডেমে ভর্তি হয়েছি, তখন কি আর ঢাকা কলেজের পরীক্ষায় মন বসে? হেসে খেলে ফাজলামো করতে করতে পরীক্ষা শেষ করে দায়িত্ব শেষ করেছিলাম কেবল।

নটরডেমে পা দিয়েই বুকটা হিম হয়ে গেল। কেউ নেই। মনে হয় ক্লাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। আমরা জানিও না কোথায় আমাদের ক্লাশ। শুধু জানতাম গ্রুপ ওয়ান। অফিসে জিজ্ঞেস করতেই জানা হলো মূল ভবনের (এখনকার পুরাতন ভবন) তিন তলায় কলেজের গেটের দিকে যে রুমটা সেখানে গ্রুপ ওয়ানের ক্লাশ। দেবদারু গাছগুলো বরাবর সোজা যে রুমটা সেটা।

দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি রুম বন্ধ। মাসুম দরজায় নক করল। একটু পরে একজন খুলে দিলে আমরা ভেতরে ঢুকি। সবার দৃষ্টি আমাদের দিকে। ক্লাশ টিচার ইশারায় আমাদের ডাকলেন- ভাবটা এমন যেন কিছু একটা খুঁজে পেয়েছেন। উনি জানতে চাইলেন আমাদের দেরির কারণ কি? মাসুমই সব সামলাচ্ছে। সত্যি কথাই বলা হলো- 'ঢাকা কলেজে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম' এটা বলার সাথে সাথে পুরো ক্লাশ হা হা করে হেসে উঠলো। যেন সবাই একযোগ বিদ্রুপ করছে আমাদের। নিজেকে এত ছোট লাগছিল যা ভাবার মতো নয়। যাহোক, ক্লাশের শেষে গিয়ে বসলাম। তখনও রোল নাম্বার দেয়া হয়নি বলে নির্দিষ্ট কোন আসনও বরাদ্দ হয় নি।

সেই প্রথম ক্লাশের পর থেকে বুঝে গিয়েছি এটা নটরডেম। ঘড়ি ধরে সব কাজ চালাতে হবে। তখন থেকেই আমরা বলতাম নটরডেম টাইম, মানে সময়ের কাজ সময়ে। কোন হেরফের নয়।

আমার ধারণায় কলেজ মানেই একটা খাতা প্যান্টের হিপ পকেটে নিয়ে ক্লাস করতে যাওয়া। কিন্তু নটরডেমে এসে দেখি অবস্থা পুরা উল্টো রীতিমত বই-খাতা-টিফিনবক্স টানতে টানতে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়, ব্যাগ একসময় পুরনো হয়ে যায়। ঢাকা কলেজের ছেলেপেলে নাকি বিনা পয়সায় বলাকায় ছবি দেখে, সে সুযোগও আমাদের ছিলনা। কলেজে পড়তে মধুমিতায় যাওয়া হয়নি কোনদিনই। সে সুযোগ ছিলনা। নটরডেম মানেই ক্লাস-ল্যাব-প্র্যাকটিক্যাল-ক্লাস, ছকে বাঁধা জীবন। খুব একটা খারাপ যে লাগতো তা বললে মিথ্যা বলা হবে।

খেলাধূলায় খুব একটা পারদর্শী কোনকালেই ছিলাম না। খেলার মধ্যে খেলতাম ক্রিকেট। একেবারে খারাপ বল করতাম না। ব্যাটে খুব একটা সুবিধা হতোনা অবশ্য। কলেজের ক্যাম্পাসে খেলা খুব একটা হতোনা। বাস্কেটবল কোর্টে টুয়েন্টি-ওয়ান কিংবা এধরনের নামের একটা খেলা ছিল। নির্দিষ্ট দুরত্ব থেকে বল বাস্কেটে ফেলতে হবে। একদিন পরপর ১১বার বাস্কেট করেছিলাম মনে পড়ে। ব্যাপারটা আসলে ততটা কঠিন নয় যতটা শুরুতে মনে হয়েছিল। প্রথম কয়েকবার প্রচেষ্টার পরে একটা ধারণা চলে আসে। সেটার উপর ভিত্তি করে খুব সহজেই বাস্কেট করা যায়।

আরেকটি ঘটনা মনে পড়ছে ফুটবল খেলা নিয়ে। আমি এই খেলাতেই সবচেয়ে আনাড়ী। ফুটবল খেলা দেখতে খুব ভালো লাগলেও কেন যেন খেলতে খুব একটা ভালো লাগেনা। গায়ের জোরের কোন খেলাই আমার ভালো লাগেনা। আমাদের সাথে অপু নামের একজন ছিল যে রীতিমত পোষাক-আশাক পড়ে খেলতে নামতো। অপু ছিল গোলকীপার-কাম-ক্যাপ্টেন। আমি মাঝ মাঠে খেলছিলাম। সেদিন খেলতে গিয়ে ঘটেছিল আমার ফুটবল জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা। একদম মাঝ মাঠ থেকে শট দিয়ে গোল দিয়েছিলাম। ঘটনার আকস্মিকতায় আমিই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী অবাক হয়েছিলাম। বুঝেছিলাম ঝড়ে মাঝে মাঝে বক সত্যিই মরে।

এই সময়ই প্রথমবারের মতো স্টেডিয়ামে গিয়ে আবাহনী-মোহামেডানের ফুটবল খেলা দেখি। দুই ঘন্টা আগে গিয়েও গ্যালারির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় যেখানে কেউ সাধারণত বসেনা সেখানে জায়গা পেলাম। কিন্তু দাঁড়ানোর সুযোগ নেই, হাঁটুর উপর ভর দিয়ে থাকতে হবে। তাই সই। এভাবেই পুরো সময় হাঁটুর উপর ভর দিয়ে খেলা দেখি। সেসব দিনের কথা মনে পড়লে মন খারাপ হয়। হায়রে সোনালী সেই দিন গুলি। খেলা শেষে দু:খে মনটা ভেঙে যাচ্ছিল। কারণ মোহামেডান হেরে যায়। মন খারাপের ঘটনা পরবর্তীতে বিস্বাদে রূপ নেয় যখন দেখি খেলা শেষ অসংখ্য মানুষ স্টেডিয়ামের উপর থেকে নীচে প্রস্রাব করে দিচ্ছিল। এতটা নীচ আমাদের মানসিকতা তা সেদিন প্রত্যক্ষ করে আমি খেলায় হারার শোক ভুলে গিয়েছিলাম।

প্রথম দিকে আমাদের বাংলা পড়াতেন জেবা ম্যাডাম। খুবই সুন্দর দেখতে। শুনেছিলাম এক ছেলে নাকি তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। তার কিছুদিন পরে উনি আর আমাদের ক্লাস নেননি। শুনেছিলাম উনি মধ্যপ্রাচ্যে চলে গিয়েছিলেন। তার পর কিছুদিন মারলিন ম্যাডাম আর এর পরে মুখতার স্যার। এক খেয়া পারের তরণী দিয়েই তিনি বছর পার করে দিয়েছিলেন।

একদম গ্যাদাকাল থেকেই আমি প্রকৃতিপ্রেমিক। শৈশবে ব্যাঙ ধরে এনে তাকে ভাত খাওয়ানোর ঘটনা আমার কিছু কিছু মনে পড়ে। নটরডেমে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকৃতির সাথে প্রেম করার সুযোগ মেলে। কলেজের অফিসের বোর্ডে ইংরেজীতে একটা লেখা ছিল:

God always forgives
People often forgive
Nature never forgives

অসম্ভব ভালো লেগে যায় কথাগুলো। ৫৫-তম সদস্য হিসেবে নেচার স্টাডি ক্লাবে যোগ দেই। ফটোগ্রাফির হাতে খড়ি হয় '৯৩এ। শেখর ভাই, শরীফ ভাই আর রনি ভাইয়ের কাছে এসএলআর ক্যামেরার খুঁটিনাটি আর ফটোগ্রাফির টুকিটাকি জানা হয়। তখন ডিজিটাল ক্যামেরার নামও শুনিনি। শরীফ ভাইয়ের প্রায় দেড় কেজি ওজনের মিনলটা ক্যামেরা দিয়ে শুরু হয় প্র্যাকটিস। সারাদিন ছবি তুলে আসিফের বাসায় বসানো ডার্করুমে ডেভলপ করা শিখি। আহারে সেই সব দিনগুলির কথা মনে পড়লে আর লিখতে ইচ্ছে হয়না। মন খারাপ হয়, চোখ ভরে যায় জলে।

গণিত পড়াতেন নিমাই স্যার। একদিন ক্লাসে উনি তার ছেলেবেলা বা কলেজ-বেলার স্মৃতি শোনাচ্ছেন। পিনপতন নীরবতা। সবাই শুনছে। এমন সময় স্যার কি যেন একটা বললেন যেটা রীতিমতো বিস্ময়কর। আর পেছন থেকে একজন বলে ওঠে, 'আর চাপা মাইরেন না'। ক্লাসের নীরবতা ভেঙে সেই কথাটি যেন সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। স্যার সহ সবাই হো হো করে হেসে উঠেছিলাম। ইংরেজীর টেরেন্স পিনেরু স্যার সম্ভবত সবচেয়ে বেশী খ্যাত (বা কুখ্যাত)। উনি ছিলেন ডিরেক্টর অব গাইডেন্স বা সংক্ষেপে ডগ। ওনাকে যমের মত ভয় করত সবাই। নটরডেমে নিয়ম ছিল দশ মিনিটের মধ্যে যদি শিক্ষক ক্লাসে না আসেন তাহলে ধরে নিতে হবে ঐ ক্লাস হবে না। একদিন কোন এক স্যার মনে হয় আসেননি। সেই সুবাদে সবাই বেশ হল্লা করছিলাম (আমি বাদে ;))। শব্দ শুনে টেরেন্স চলে আসে। জিজ্ঞেস করে কারা কারা শব্দ করছিল। কেউ কি আর বলে? আমরা সবাই চুপ করে আছি। কারো কাছ থেকে কোন ক্লু না পেয়ে উনি করেন তার বিখ্যাত সেই উক্তি, 'টেন থাউজ্যান্ড টাইমস'। অর্থাৎ কোন একটা নীতিবাক্য দশ হাজার বার লিখে আনতে হবে। আমাদের জন্য বরাদ্দ হলো I shall never disturb any class should the teacher be late. মেজাজ চরম খারাপ হলো। কারণ অপরাধ না করেই অপরাধের শাস্তি নিতে হল বলে। দশ হাজার বার লেখা কি চাট্টিখানি কথা? আমি মনে হয় হাজার খানেক লাইন লিখেছিলাম। পাভেল তার সেক্রেটারি বাপকে দিয়ে লিখিয়েছিল কয়েকশ লাইন, হা হা হা... সেদিনে কথা মনে পড়লেই হাসি পায়। দশ হাজার বার লেখা হয় নি বলে কী ভয়ই না পেয়েছিলাম। অথচ একশ বার লিখে

দিলেই হতো। না লিখলেও হয়তো কিছুই হতোনা।

১৯৯৪ সালে কলেজ জীবন শেষ হলেও শেষ হয়নি কলেজের সাথে বন্ধন। নেচার স্টাডি ক্লাবের আজীবন সদস্য হিসেবে নিয়মিত যাওয়া হতো। তাছাড়া বায়োলজি ল্যাবে ল্যাব-ব্রাদার হিসেবে কাজ করেছি বেশ কিছুদিন। মূল ভবন আর মার্টিন হলের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটাতে নতুন বিল্ডিং এর কাজ শুরু হয় আমাদের সামনেই। সেখানে আজ দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ভবন, কিন্তু আমার স্মৃতিতে পুরনো নটর ডেম এখনো অম্লান। নটর ডেমের ব্যস্ত জীবনে ক্যান্টিনে বেশ খানিকটা সময় কেটেছে। ক্যান্টিন এখনো হয়তো আগের মতই আছে। সেই সময় গরমের শুরুতে বাঁদর লাঠি গাছের হলুদ ফুলে ছেয়ে যেত ক্যান্টিনের টিনের ছাদ।

মনে পড়ে মাইকেল জ্যাকসনের ব্যাড কিংবা ফতেহ আলী'র গান বাজতো অবিরত। ক্যান্টিন ছিল সিমেন্টের তৈরী একটা টেবিল টেনিস খেলার টেবিল। পরে মনে হয় একটা সত্যিকারের টেবিল কিনে দিয়েছিল। মনে পড়ে জীবনের প্রথম টেবিল টেনিস খেলায় পাভেলকে হারিয়ে দিয়ে কোক জিতেছিলাম। এর পর থেকে টেবিল টেনিসের নেশায় পেয়ে বসে। সেকেন্ড ইয়ারের শেষের দিকে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বহুদিন টেবিল টেনিস খেলেছি। তব সব সময়ই টেরেন্স-এর ভয়ে থাকতাম। শোনা যায় উনি নাকি হুটহাট ক্যান্টিনে চলে আসতে এবং কাউকে ক্লাসের সময় খেলতে দেখলেই বেল্ট খুলে পেটাতেন। আমাদের এমন দুর্ভাগ্য কখনো হয়নি অবশ্য টেবিল টেনিসের নেশা আস্তে আস্তে সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল। অবস্থা এমন যে টেবিল ফাঁকা পাওয়াই মুশকিল। এর মধ্যে পাভেল একদিন খবর আনল বুয়েটের কোন এক হলে অনেকগুলো টেবিল আছে-- সেগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। এর পর বহুদিন ফাঁকি দিয়ে বুয়েটের সেই হলে গিয়ে খেলেছি। হলের নামটা মনে নেই তবে বুয়েটের মূল ফটকের বিপরীতে যে হল সেটার নীচতলায় ছিল খেলার রুম।

নটরডেম বললেই চলে আসে মতিঝিলের কথা, গুলিস্তানের কথা। আজকের মতিঝিলের যে অবস্থা, ৯২-৯৩ সালে এতটা ভীড় আর এতটা খারাপ অবস্থা ছিলনা। মোহাম্মদপুর থেকে উন্নত সংস্করণের মুড়ির টিনের বাসে যাওয়া আসা করতাম। মিরপুর রোডে এতগুলো শপিং মলও তখন ছিলনা। বলা যায় আমাদের সামনেই আস্তে আস্তে বদলে গেল ঢাকা শহর। আমরা বড় হতে হতে কলেজ পার হলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে পা দিলাম। জীবন চলতে থাকলো সময়ের নিয়মে।

সহপাঠীদের সাথে পরিচয় কিংবা কথা বিনিময়ের সুযোগ ছিল কম। মনে পড়ে রোল নম্বর সিক্সটি ফোর-এর কথা। কলকাতায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খেলা দেখতে গিয়ে দূর্ঘটনায় মারা যায়। ওর মুখটা কি কোনদিন ভুলতে পারবো? ও তো বসতো আমার ডান দিকের সারিতে। কোন এক কারণে এসি দাস স্যার ওকে প্রায়ই পড়া জিজ্ঞেস করতো। এখনো চোখ বন্ধ করলেই আমি দেখতে পাই রাজীব দাঁড়িয়ে স্যারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। মানুষের মস্তিষ্ক কেন যে এত কিছু মনে রাখে! সবকিছু ভুলে থাকতে পারলে হয়তো ভালো হতো।

নটরডেম থেকে চলে গেছেন টেরেন্স পিনেরু। চিরতরে চলে গেছেন বিদ্যাসাগর মল্লিক, ফাদার কস্তা সহ আরো অনেকে। আজমল স্যার, বনিক স্যাক মিজানুর রহমা ভুঁইয়ার স্যার- এঁদের কথা সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে। হয়তো বায়োলজি ভালো লাগতো তাই। মনে পড়ে ফাদার পিশোতোর ক্লাস নেয়ার কথা। ছেলেপেলে ক্লাসে হৈচৈ করলেই উনি বলতেন 'কোয়ায়েট'। এই মানুষগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রম আর ভালোবাসায় আমরা পেয়েছি উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার অন্যতম সেরা একটি প্রতিস্ঠান। সেদিনের মতিঝিল, সেদিনের গুলিস্তান বদলেছে অনেক, বদলেছে মানুষ, হারিয়ে গেছে অনেকে, এসেছে নতুনত্ব। এভাবেই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে যাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। একদিন আমিও থাকবোনা, হয়তো থাকবে সামান্য এই স্মৃতিচারণটুকু।

সচল নামঃ প্রকৃতিপ্রেমিক
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/propremik

মনে পড়ে প্রতি টানে

...সাজিদ আরেফিন

আমার কলেজ হল জিয়া সার কারখানা কলেজ। ক্লাসমেটরা সব পূর্বপরিচিত, একই কলোনিতে বসবাস, একই স্কুল থেকে পড়ে এসেছি। তারপরও স্কুল থেকে কলেজ জীবন ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম।

স্কুলে বখে যায় গুটিকয়েক পোলাপাইন- তাদেরকে সবাই চিহ্নিত করে রাখে, শিক্ষকদের মাইর তাদের জন্য রেগুলার, বাবা-মারা নিষেধ করে তাদের সাথে মিশতে এমনকি কোন কোন সহপাঠী নিজেদের বুদ্ধিতেই তাদেরকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু কলেজে উঠে বখে যায় সবাই। তখন ক্লাসের প্রথম আর শেষ রোলধারী সবাই এক কাতারে।

আমাদের ক্লাসের কারো কারো সিগারেটে হাতেখড়ি স্কুল থেকেই, কলেজে উঠে সেটা নিয়মিত হয়ে গেল, আরো নতুন আসতে লাগল। কলেজের চারতলাটায় হত ডিগ্রীর ক্লাস, সপ্তাহে দুই দিন। কাজেই আমাদের যাবতীয় খারাপ কাজের স্থান হয়ে গেল চারতলাটা।

একজন নতুন গিটার শেখা শুরু করল, সে কলেজে গিটার নিয়ে আসত, আমরা দল বেঁধে চারতলায় উঠে ক্লাস বাদ দিয়ে গান গাইতাম। সিগারেট খাওয়া চলত সিঁড়ির মুখে, নয় টয়লেটে বা ক্লাসরুমে দরজা বন্ধ করে।

তো একবার রসায়ন ক্লাস মিস দিয়ে চারতলায় উঠলাম, কেউ খেয়াল করলাম না যে ক্লাসের সব ছেলে এসে পড়েছি। স্যার এসে দেখলেন শুধু মেয়েরা বসে আছে ক্লাসে (মেয়েরা জন্মগতভাবে ক্লাস খুব ভালবাসে!)।

তাদের কাছ থেকে তথ্য পেয়ে স্যার উঠলেন চারতলায়। সিঁড়ি দিয়ে দেখতে পেয়েই যে যার মত পালাতে শুরু করল। আমরা কয়েকজন আড্ডা মারছিলাম আড়ালে, আমাদের মধ্যে একজন আবার সিগারেট টানছিল। স্যারকে মুখোমুখি দেখে আমরা চুপ, দূরে থাকলে হয়ত দৌড়ানোর একটা চান্স নিতাম। যে সিগারেট টানছিল সে তাকিয়ে ছিল আমাদের দিকে, স্যারকে পিঠ দেখিয়ে। সে সিগারেটে দিল একটা লম্বা টান, তখুনি স্যার তার কাঁধে হাত রাখল। বন্ধুটি ঘুরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে স্যারের মুখের উপরই সব ধোঁয়া ছেড়ে দিল।

এরপর কি ঘটল কল্পনা করে নিন, শুধু বলি- কলেজ ছাত্র হওয়ার কারনে কোন শারীরিক শাস্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়নি।

সচল নামঃ স্পার্টাকাস
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/spartacus

কল্জেতে যেই কলেজেরই এক ছাপ নিয়ে দিই পথপাড়ি

...সাইফুল আকবর খান

"কোলকাতার মেয়েরা, বাংলাদেশের ছেলেদেরকে খুব পছন্দ করে! তুমি গেলে দেখবে- ওরা কয়েকজন হেঁটে যাওয়ার সময়, এক সখীর গায়ে ঠেস দিয়ে অন্য সখী বলবে- "দ্যাখ্ দ্যাখ্, বাংলাদেশের ছেলে, বাঘের বাচ্চা একটা!" আর, যদি শোনে- তুমি নটরডেম কলেজের ছাত্র, তাহলে তো তোমার সামনে বেচ্যায়েন হয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে!"

না, কলেজের নামেই কোলকাতার কিংবা ঢাকার-খুলনার কোনো মেয়েকে চ্যায়নে বা বেচ্যায়নে কোনোভাবেই শোয়ানোর জন্য আমরা কেউ পড়িনি ওই ছেলেদের কলেজটাতে। কেন পড়েছি- সেটা বলা অবশ্য কমবেশি মুশকিলের বিষয়। অন্তত আমার জন্য তো তা-ই বটে! নাতিদূর-সম্পর্কের দুটো ভালো-ছেলে মামাকে আমরা দুই পিঠেপিঠি ভালো-ছেলে ভাই, নিজেদের এবং পরিবারের মুগ্ধ চোখে, অনুসরণ না করলেও দেখে আসছিলাম, আমরা কলেজের কাবিল হওয়ার আরো বেশ কবছর আগে থেকেই। সেই ভালো মামাদের মধ্যে ভালোর সাধারণ যোগসূত্র একটাই ছিলো- তারা দুজনই নটর ডেমে পড়েছিলেন। আমাদের বাবা ছিলেন বংশের সরল সুতোয় প্রথম, আর সহপ্রজন্মা সহবংশীদের মধ্যে খুব সম্ভবত একমাত্র, গ্র্যাজুয়েট। তাঁর পৌঁছানো হয়নি রাজধানীর এমন উঁচুদামের কলেজ পর্যন্ত। কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজ-ই ওই অঞ্চলের ওই আমলের জন্য ছিলো গুরুতর বিষয়। তো, সেই মামাদের সুবাদের সাথে আরো কোনো এক বা একাধিক স্পিলওভার কারণের মিলিত ফলে তাঁর (আমার বাবার) খুব বড় শক্ত সোজা ইচ্ছে ছিলো- দুই ছেলেকেই পাঠাবেন কলেজ নামের বাতিঘর নটরডেমের দিকে।

আমরা ভালো ছেলে। আমরা ভালো ছাত্রও ছিলাম, অন্তত ওইকাল পর্যন্ত। আসলে, খারাপ ছেলে বা খারাপ ছাত্র যে কেন বা কীভাবে হতে হবে- সেটাই তো বুঝে পাইনি ওই সাবালক বয়েসেও। পরপর দু বছরে দুভাই দুটো ছোট ছোট শরীরের মধ্যে যথেষ্ট মফস্বল-মগড়া আর বড় দুটো কল্জে নিয়ে রাজধানীতে এসে শুধু এই একটা কলেজেই ভর্তিপরীক্ষা আর সাক্ষাৎকার দিয়ে, ঠিকই টিকেও গেলাম, মনে হলো যেন চাঁদে নামলাম চতুর্থ আর পঞ্চম মানবসন্তান হিসেবে! ভাই আর্টস জি-তে, আর আমি সায়েন্স ওয়ান-এ। ভর্তি হওয়া পর্যন্তই সেটার কারণ আমাদের দুজনের কাছেই ওই একটাই শুধু- বাবার ইচ্ছে। ভর্তি হয়ে, একদম নবীনবরণ থেকে শুরু করে কলেজ সাময়িকী চিটচ্যাট আর ঢাকঢোল পড়তে পড়তে আর ধীরে ধীরে লম্বা সময় নিয়ে অন্য বই আর অন্যান্য কিছু হালকা পতনও পড়তে পড়তে, আবিষ্কার আর অধিকার করে নিলাম ওই কলেজে পড়ার উত্তরোত্তর অহংবোধ। না, এটা বিশ্বজয় না মোটে, তবু ওই ছোট প্রাণ আর ছোট ছোট চোখগুলোর জন্য ওই আপন আপন কিন্তু উঁচু আলোর হাতছানি কতো সুন্দর কতো বড় ছিলো- সেটা ওই কলেজের ছাত্র মাত্রই বলতে পারবেন বুকে হাত দিয়ে, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম।

গল্পের শুরুতে উল্লেখিত বিখ্যাত অতিরিক্ত রসোক্তিটি আমার বা আমাদের কলেজের অন্যতম কিংবদন্তি, বাংলার রসময় শিক্ষক মোক্তার আহমেদ চৌধুরীর। তাঁর জুতোয় দেখে চুল আঁচড়ানো যায়, তাঁকে একের বেশি দিন এক জামা-প্যান্ট পরতে দেখা যায় না কখনও, তাঁর চশমা-ঘড়ি-বেল্ট-জুতোও বদেল বদেল যায় প্যান্ট বা অন্য আরো কিছুর সঙ্গে রঙে-ঢঙে ঠিকঠাক ম্যাচ করানোর শখে কিংবা সুখে, তাঁর ভাষাও শার্ট-প্যান্টের মতোই নিয়ত ইস্ত্রি করা, সবসময় অতিরিক্ত শুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন তিনি, ব্যাকরণের প্রত্যেক অধ্যায়েই তাঁর গোটা চার-ছয় দৃষ্টান্তমূলক গল্প আছে (যেগুলোর প্রায় সবই নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে দাবির ঝলকে বর্ণনায় যথার্থই উজ্জ্বল), স্মরণীয় ঘটনা বিষয়ক প্রবন্ধ রচনার চিরায়ত আলোচনায় তিনি তোমার খাতার প্রথম পাতায় / যেদিন আমি থাকবো না / আঁকবো না, লিখবো না, কল্পনা বলে বলে হরলাল রায়ের জীবনোদ্ধার করে ছাড়েন, তাঁর চোখ-জিভ্-মন-মাজা সবই খুবই রসে-কষে টইটম্বুর টসটসে- এরকম আহারে-বাহারে মজার গল্প তাঁকে নিয়ে প্রবাহিত প্রচলিত আছে আরো হাজারে হাজার।

প্রাণিবিদ্যার গাজী আজমল আর মিজানুর রহমান ভুঁইয়াদেরও বিচিত্র রসিকতা; রসায়নের রস-কষ সব ছুটিয়ে দেয়া এসিডিটি(!) [অমর চাঁদ দাস তালুকদার]'র সাইলেন্ট-বাট-ডেডিল বোমাবাজি আর বিদ্যাসাগরের নদীকূল-সুলভ হেই মিয়া ওই ব্যাটা সুরের পেঁজা পাতলা ঝাড়িবাজি; পদার্থের ক্লাসে গল্পে গল্পে ফাদার পিশোতোর একের পর এক সূত্র আবিষ্কার; ম্যাথম্যাট্রিক্স(!)-এর মুকুটহীন রাজা নিমাই চন্দ্র দাসের বিস্ময়কর সব উপমার সাথে মিশিয়ে গণিতের দ্রবণকে লঘু এবং সহজ করার বিস্ময়কর কৌশল আর সব ধরনের গণিতের নিজস্ব অনন্য

মেথডায়ন(!); গণিতেরই অন্য শিক্ষক জওহরলাল সরকারের স্যার স্যার সম্বোধনে অগাণিতিক সব জেনারেল-পনা (হোমওয়ার্ক না করার গণ-অপরাধে একটা কলেজের একটা পুরো গ্রুপকে সূর্যের দিকে চোখ রেখে রোদের মধ্যে দুই ঘণ্টা বসিয়ে রাখার শাস্তির কথা অসামরিক কিংবা অনটরডেমিক কোনো ছাত্র কখনও চিন্তাও করতে পারেন কি?! আমার ঠিক জানা নাই।); বাংলার (বিহারের আর উড়িষ্যার না হলেও!) গ্যাব্রিয়েল মানিক গোমেজের রাজা-উজির-বধ পর্যায়ের চোয়ালচর্চা; ইংরেজির সুশীল স্যারের সত্যি সত্যিই তাঁর নামের প্রতি শতভাগ সুবিচার আর জাহাঙ্গীর আলমের অল-সিজন দামাল তুমুল খ্যাপা পাগলামি; পুরো দেড় বছর ধরে ভীষণ আশা করেও একটাও ক্লাস পেলাম না ইংরেজির যেই অল্পদেখা-সুন্দরী শারমেন রড্রিক্স-এর- তাঁর, কিংবা নিয়তির আরো এক নিষ্ঠুর পরিহাসে আমরা কলেজ শেষ করে প্রায় বেরিয়ে যেতে যেতে এত এত লেট-টিনেজ ছেলের অনুন্নত বুকে প্রচণ্ড আফসোসের ধোঁয়া জ্বালিয়ে কেবল-ঢোকা অর্থনীতির মারকুটে সুন্দর শিক্ষিকা হোসনে আরা মৃধার রূপ-কথা- এমন করে আরো অন্যদের নিয়েও অন্য নানা গল্প আছে প্রচুরের চেয়েও বেশি। সেগুলো আপনি এমনিতেই আরো অনেক জায়গায় শুনেছেন শুনছেন শুনবেন, কিংবা আপনিও আমার সতীর্থ হয়ে থাকলে আপনিও অন্যদেরকে বলেছেন বলছেন বলবেন। উত্তরজীবনের জন্য গল্প-মহাগল্পের একটা মস্ত বড় কারখানা এই নটর ডেম কলেজ। এই দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে সবার সমস্ত গর্ব-আলাপন, আস্ফালন আর জাবর-কাটাকাটির সমষ্টির মধ্যে, সবচেয়ে বেশি গল্প খুব-বোধ-করি এই কলেজেরই হয়েছে। সম্মিলিতভাবে ক্যাডেট কলেজগুলোর গল্প হঠাৎ হলে হতেও পারে এরচে বেশি, কিন্তু এককভাবে কোনো কলেজ নিয়ে আড্ডায় গড্ডলিকায়, যেকোনো জায়গায়, গল্পে মনে হয় আমার কলেজই সর্বোচ্চ গোলদাতা (গোল-এর সকল অর্থে)।

নবীনবরণের মধ্যেই হাতে পাওয়া ঢাকঢোল-এ দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের একটা লেখায় একটা সত্যি গল্প পড়েছিলাম, তারও একটা প্রথম অভিজ্ঞতারই গল্প সেটা। ভর্তিপরীক্ষা বাবদ প্রথমদিন কলেজে পা দিয়েই, আলিঝালি মলিন শার্ট-প্যান্ট পরা এক বিদেশীকে তিনি দেখেছিলেন- কলেজ করিডোর ধরে হেঁটে হেঁটে অন্যপ্রান্তের কোনো রুমে যাচ্ছিলেন সময়, নিচে একটা পরিত্যক্ত দুমড়ানো কাগজ পড়ে আছে দেখতে পেয়ে, মাটিতে নুয়ে হাতে তুলে নিয়ে আবার আরো কতোটা পেছন হেঁটে করিডোরের পাশের গার্বেজ বক্সে সেটার সৎকার করে তারপর আবার আগের দিকে হেঁটে যেতে। পরে, ভর্তির পরে, নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হতে হতে সেই ছাত্র জানতে পেরেছিলেন- সেই বিদেশী লোকটিই এই কলেজের প্রিন্সিপাল, ফাদার জে এস পিশোতো।

আমার কলেজের গল্প এমন সৎ সত্যি কিছু অবাঙালী মাটির মানুষের গল্প- যাঁরা শিশুর মতো স্বচ্ছ শুভ্র সরল; যাঁরা ভিনদেশী ভিনভাষী হয়েও বছরের পর বছর বহু কষ্টেসৃষ্টে বাংলা শিখে আমাদেরকে মূলত বাংলাভাষায় পড়ান। আমার কলেজের গল্প এমন কিছু বিরল বাঙালী পণ্ডিতেরও গল্প- যাঁরা সত্যকালের কিছু অন্তত আলো-অবশেষ আমাদের মুখের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছেন অনন্ত রূপে। আমার কলেজের গল্প ইংরেজির জাহাজের ঘুমভোলা নাবিক আর ইংরেজি সাহিত্য-সাগরের ভয়ভোলা ডুবুরি টেরেন্স পিনেরোর গল্প- যাঁর শৃঙ্খলার-পরাকাষ্ঠা মা নাকি ওই বিবাহিত, মেয়ের-বাবা এবং কলেজ-শিক্ষাপরিচালক-ছাত্রউপদেষ্টা বয়সেও ঘুম থেকে উঠতে নির্ধারিত সময়ের থেকে একটু দেরি হয়ে গেলে তাঁকে সকালের নাশতা দিতেন না; কলেজেও যাঁর টয়লেটেও সবসময় একটা না একটা বই থাকতো, যেন পড়বার ওই অতোটুকু সময়ও জীবন থেকে বাদ না যায় জৈবিক আপদের আছরে। (ধরে নিতাম) রাতজাগা পাঠে (এবং ছোট্ট আমাদের আরো একটা বড় ধরে-নেয়া অনুযায়ী, হয়তোবা, পানেও) রক্তলাল হয়ে থাকা চোখে তিনি যেদিকে তাকাতেন, সেদিকে যেন তরুলতা-পশুপাখিও একসাথে এক ঝটকায় সব সারি সোজা করে নিশ্চুপ বসে পড়তো তাঁর নিয়ম-শৃঙ্খলার ক্লাসে! কলেজের ছাত্র উপদেষ্টা বা শিক্ষা পরিচালকের অনেক কড়া কঠোর হতেই হবে, ওটা হয়তো বলবার মতো বিশেষ বিষয় না কোনো। কিন্তু, "আমি যদি তোমাকে একটা লাথি দিই, আর তুমি যদি ফাদার পিশোতোকে গিয়ে বলো- 'টেরেন্স স্যার আমাকে লাথি মেরেছে, তাহলে ফাদার পিশোতো আমাকে কিছু বলবেন না, বরং উনিও তোমাকে আরেকটা লাথি দেবেন- এমন কথা বলবার মতো ক্ষমতা বা অহং বুঝি দরিদ্র মনের এই পোড়াদেশে শুধু নটর ডেমেই এবং এমনকি হয়তো শুধু টেরেন্স স্যারেরই ছিলো। ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে পড়াশোনার ভিতরে-বাইরে সব সমস্যার সমাধান যেমন করতেন তিনি, তেমনি কোনো ছাত্র নিজেও সমস্যা হয়ে উঠলে তার ওপর সবচে সমীচীন সবচে কঠোর সিদ্ধান্ত নিতেও তিনি কখনই এতটুকু টলে ওঠেননি, কখনই টলেনি তাঁর শৃঙ্খলা, কখনই ভাঙেনি কলেজের এত এত ছাত্রের পায়ে শুভতম আশীর্বাদ হিসেবে পরিয়ে দেয়া সেই নিয়মের শৃঙ্খল। কলেজ ছাড়ার এত বছর

পরেও, টেরেন্স স্যারের মৃত্যুসংবাদ কী যে ভারি হয়ে এসেছিলো কানে, কতোদিন যে চেপে বসে ছিলো বুকে! কতো কতো দুষ্টু মেধাবী ছাত্র যে আমাদের পূর্ব-উত্তরকালে এই কলেজে ঢুকে দুষ্টুর চামড়া খুলে ফেলে মেধার নতুন সংস্কৃত রূপ নিয়ে নতুন মানুষ হয়ে বেরিয়েছে, সে তো নটর ডেমের পিতৃপ্রতিম কজন আদর্শ শিক্ষক আর তাদের আপোসহীন নিয়ম-দর্শনেরই জোরে।

আমার কলেজের গল্প বাংলার আরেকজন ভিন্নমার্গীয় শিক্ষক গিয়াস শামীম চৌধুরীরও গল্প- যিনি ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ আবু হেনা মুস্তফা কামালের ভাবশিষ্য, এবং নিজেও সেই গুরুর মতোই নিজের ছাত্রদের সাথেও ব্যক্তিসম্পর্কে গভীর হওয়ার চেষ্টায় মুখ-নাম-রোল চিনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাস্টমাইজড পাঠদান ও মূল্যায়নের যত্নে অনন্য ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্রত্ব থাকাকালীনই একবার কলাভবনে বাংলা বিভাগের বারান্দায় তাঁর সাথে আবার দেখাও হয়ে গ্যালো যখন, সেই ওজনদার মাপা হাসি-সমেত তাঁর সেই চেনা মূর্তির সঙ্গে আমার চোখাচোখিতে সেই পরীক্ষাও হয়ে গ্যালো- তিনি আমাকে চিনতেও পারলেন। আমার কলেজের গল্প আমার আরেক বিস্ময় ব্যক্তিত্ব, উদ্ভিদবিদ্যার জাদুকর শিক্ষক অমল কৃষ্ণ বণিকের গল্প- যাঁর দৃষ্টি, ভাব, বচন, আচরণ সবই দেখেছিলাম অনন্য। বিভিন্ন রঙের চক ব্যবহার ক রে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকতেন লিখতেন খালিহাতে নিখুঁত সব সরল-বক্র রেখা-বৃত্ত আকার আকৃতি। ক্লাসে এসেই হাতের ঘড়িটা খুলে রাখতেন ডায়াসে, একটাও অন্য কথা বলতেন না পড়ার বিষয়ের বাইরে, যেই ক্লাসের আলোচ্য অধ্যায়ে ঠিক যা যা পড়ানোর কথা বা পরিকল্পনা, পুরোটা শেষ করতেন মাপে মাপে আর ক্লাস শেষের ঘণ্টাটাও বাজতো ঠিক তখনই। আমাদের ওই বিস্ময় চূড়ান্তে পৌঁছে, যখন কিনা বিরোধী দলীয় অসহযোগ-ধর্মঘটের নানামুখী ঝামেলার মধ্যে অন্য কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকাই সে-বছর সিলেবাস ঠিকঠাক শেষ করতে না পারলেও এক বণিক স্যারই একইভাবে শেষ ক্লাসের শেষ মুহূর্তে সিলেবাসের শেষ অধ্যায়ের শেষ কথাটি বললেন! কী যে এক ঘোরলাগানো নাটকীয় পরিসমাপ্তি! সবশেষে, আমার কলেজের গল্প খুব দুঃখের সাথে আমার অত্যল্প-সামাজিক কলেজ-জীবনের একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু নাসিরেরও গল্প- যার সঙ্গে ঢাকা শহরের এদিকে ওদিকে রিকশায় আর পায়ে চড়ে ঘুরে ঘুরে, কৃষ্ণচূড়া দেখে, রেস্টুরেন্ট আর অ্যাপার্টমেন্ট দেখে দেখে, ঢাকা শহর একটু একটু করে চিনেছিলাম মফস্বল থেকে আসা সহজ সরল এই আনাড়ি আমি। কলেজ শেষের পরেও ওর সাথে হালকা হলেও একটা চিঠি-যোগাযোগ আমার ছিলো। কিন্তু, বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়ে হল-এ না উঠে একা একা একটা বাসায় থাকতো সে, তারপর এক সময় আচরণ-কথাবার্তা একটু একটু করে অস্বাভাবিক অসংলগ্ন হয়ে একসময় পুরো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো, খবর পেয়ে ঢাকা থেকে তার পরিবার গিয়ে তাকে নিয়ে এলো, তারপর তার আর কোনো হদিস পাওয়া গ্যালো না। তার কোনোকালের কোনো বন্ধুই তাকে আর খুঁজে পেলো না আর কোনোদিন।

কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীর পুনর্মিলনীতে যোগ দিতে আমি যাইনি, কলেজের হারানো সময়টা নিয়ে পলায়নপর আমার অনেকেই মন খারাপ হবে বলে। এখন কখনও কলেজটার কাছে দিয়ে কোথাও যাওয়া পড়লে, এ বিষয়টাও মনে হয়ে একটা কেমন ভালোও লাগে খুব, যে কলেজের এখনকার নতুন ভবনটাতে আমাদের পড়া না হলেও সেটার নির্মাণের ইট-সিমেন্টে আমারও ছোট্ট একটু স্থায়ী অংশগ্রহণ ছিলো। আর, আজ পর্যন্ত যেখানেই কোনো নটর ডেমের ছাত্র পাই বর্তমান কিংবা প্রাক্তন, খুশিতে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে যায় ভীষণ এক সাজাত্যবোধে। ব্লগিং শুরু ক রেও যে নির্দিষ্ট আয়তনটাতে ভিড়লাম আপন জ্ঞান করে, সেখানেও যে বিভিন্ন বয়সের এত এত তরতাজা বালক নটরডেমিয়ান বেরুলো, এটা দেখেও যেন জায়গাটা আরো অনেক অনেক বেশিই আপন হয়ে গ্যালো।

কলেজের দেড়টা বছর যেন খুবই সশ্রম একটা জেলখানায় ছিলাম। হাজার হাজার ক্লাবের কলেজ নটর ডেমেও টুকটাক ক্রিকেট-ফ্রিজবির বাইরে আর কোনো একস্ট্রা-কারিকুলার কিছুতেই আমি ছিলাম না। প্র্যাকটিক্যাল আঁকতে লিখতে জীবন বের হয়ে যেতো সারা সপ্তাহ। তার ওপর আবার কুইজ চালু থাকার পুরো মৌসুমগুলোতে মোটামুটি নিয়ম করেই প্রতি সপ্তাহে দুই রাত একেবারেই ঘুমাতাম না- ক্লাসের সাথে ঠিকঠাক পড়া কাভার না করতে পেরে কুইজ-পরীক্ষার পূর্বরাত্রিতেই, নোনা নোনা গ্র্যান্ড চয়েস বিস্কুটের প্যাক হাতে কোনোমতে বইয়ের ওপর উপুড় পড়ে থেকে, হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে সাগর-দিগন্তের কিনারে পৌঁছাতাম একেবারে ভোরের পরে সূর্যের সাথে সাথে। নিজের ইচ্ছার সাথে মিল হয়নি যদিও, তবু বাবার পরবর্তী স্বপ্নও পূরণ করতে পারার জন্য যথেষ্ট পড়াই যে আর পড়তে পারলাম না পরের আরো বড় ভর্তিপরীক্ষার জন্য, সেটারও অন্যতম একটা কারণ বলে আমি চিহ্নিত

করবো আমার মতো অযান্ত্রিক হ্রস্যদৃষ্টি মানুষের সেই দেড়বছরের ভয়ঙ্কর ক্লান্তিকর কারাবাস-টাকেও। যখন একবার ছাড়া পেলাম সেই কারাগার থেকে, তখন স্বাধীনতার দীর্ঘ ক্ষুধায় একেবারে স্বরাজ বসিয়ে নিলাম নিজের দুনিয়াতে। ভাবটা এমন, যেন- "অনেক পড়া হয়েছে বাবা! এবার উঠে প্যান্টের ধূলোটা ঝেড়ে নিয়ে একটু জানালার বাইরেটায় চোখ দাও, চোখ দাও নিজের অন্য ভিতরে। শরীর আর মস্তিষ্কের এত পরিশ্রমে অমানুষ বনে গিয়ে কলেজে থাকার ওই সময়টাতে সত্যি সত্যি মনে হতো- পরিচিত পরিজনের আর কোনো ছেলেকে আমি অন্তত এই কলেজে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ আর দেবো না এই জীবনে। আর, এখন, আরো অনেকটা পথ অনেকভাবে পাড়ি দিয়ে, পৃথিবীর আর নিজের সঙ্গেও আরো অনেক বোঝাপড়ার পরে, বাইরে থেকে দেখে পরে বুঝি- আমরা এখন যে যা-ই হয়েছি, যতোটুকুই বা দূরত্ব অতিক্রম করেছি, যেখানেই আছি, যেভাবে জীবন দেখি, সবকিছু ভেঙে পড়ার ঘোর দুঃসময়েও যতোটুকুই আলো আর যন্ত্রণা এখনও ধারণ করি সমান সমান্তরালে, এই সবকিছুর পিছনে শীর্ষ তিনটা কারণ বা নিয়ামকের একটা অবশ্যই আমাদের কলেজ, সারাজীবনের গৌরবের প্রিয়তম প্রাঙ্গণ- আমাদের, আমার নটর ডেম কলেজ।

সচল নামঃ সাইফুল আকবর খান
সচল ঠিকানাঃ
http://www.sachalayatan.com/user/syfulak

স

প্রকাশায়তন

কলেজ স্মৃতি

সচলায়তনের কলেজ স্মৃতি সংকলন